ব্যক্তিক–সত্তা নির্মাণ ও দার্শনিক তন্ত্র : মূলস্রোত থেকে নারীবাদ

মনোজ নস্কর

নিবন্ধন ক্রম : AOOPH1200315

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : কান্ট-এর দর্শন ও বিচারবাদী দার্শনিক তন্ত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : হিউম-এর দর্শন ও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক তন্ত্র

তৃতীয় অধ্যায় : উদারপন্থী নারীবাদ ও নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র

চতুর্থ অধ্যায় : চরমপন্থী নারীবাদ ও নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র

পঞ্চম অধ্যায় : ব্যক্তিক-সত্তা নির্মাণ-এর আখ্যান ও দার্শনিক তন্ত্র

গ্রন্থপঞ্জি

সারসংক্ষেপ

দর্শনশাস্ত্র হল বিভিন্ন শাখা–প্রশাখার সমন্বয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান। চিরাচরিত দর্শনচর্চার যে ধারা, সেখানে লক্ষ করা যায় যে, তত্ত্বের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তা সর্বদাই নির্মিত হয়ে এসেছে ব্যক্তিক–সত্তার বিষয়নিষ্ঠ স্বরূপের ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে সত্তার বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপ কখনোই আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কারণ মনে করা হত তত্ত্ব মাত্রই সার্বিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং তত্ত্বের প্রেক্ষিতে কোনো বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপ বা অনুষঙ্গ আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই সঙ্গতি কেবল যে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বগত তাই নয়, বিভিন্ন শাখা–প্রশাখা সমন্বিত সমগ্র দর্শনশাস্ত্রেও সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক দার্শনিক তন্ত্র লক্ষ করা যায়।

কালক্রমে দর্শনচর্চার জগতে মূলস্রোতের চিরাচরিত ধারাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আত্মপ্রকাশ করে নারীবাদী চিন্তাধারা, যেখানে ব্যক্তিক–সত্তার বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপ সাপেক্ষে তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক তত্ত্ব নির্মাণ অপেক্ষা, তত্ত্ব এবং ব্যক্তির যাপনের অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করার বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এই চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্যক্তিক–সত্তার স্বরূপ ও তত্ত্বের প্রকৃতি পরস্পর অনুস্যূত। ফলে বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপের অনুষঙ্গকে অগ্রাহ্য করে তত্ত্ব নির্মাণ করাটা তাঁদের কাছে অনভিপ্রেত। নারীবাদী চিন্তাধারায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট কিছু বিক্ষিপ্ত তত্ত্বের সমাবেশ থাকলেও, নেই কোনো সুনির্দিষ্ট তন্ত্রকাঠামো, যা কিনা দর্শনচর্চার প্রেক্ষিতে অপরিহার্য্য বলে মনে করা হয়।

দর্শনের জগতে ব্যক্তিক–সত্তার বিভিন্ন প্রকার গঠন ও স্বরূপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ‘আণবিক সত্তা’ ও ‘সম্পর্কিত সত্তা’। এক্ষেত্রে আণবিক সত্তা বলতে বোঝায় সেই সত্তা যা যাবতীয় প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের অনুষঙ্গকে অস্বীকার করে স্ব–স্বরূপে অবস্থান করে। বিমূর্ত যুক্তিপ্রয়োগের সক্ষমতাই এর বিশেষ ধর্ম বলে মনে করা হয়। অপরদিকে সম্পর্কিত সত্তা হল সেই সত্তা যা সর্বদাই কোনো না কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে; সম্পর্কের অনুষঙ্গ ব্যতিরেকে বা প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবে কোনো অবস্থান তার থাকে না। এই সত্তা আণবিক সত্তার ন্যায় বিমূর্ত যুক্তিপ্রয়োগে অক্ষম। আবেগ–অনুভূতি–সংবেদনশীলতাই এর বিশেষ গুণ।

বর্তমান গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত কিছু তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনার মধ্য দিয়ে মূলস্রোত ও নারীবাদী চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে, ব্যক্তিক–সত্তার বিভিন্ন প্রকার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে বিভিন্ন শাখা–প্রশাখা সমন্বিত দর্শনশাস্ত্র তথা দার্শনিক তন্ত্রকে প্রভাবিত করে তার অনুসন্ধান।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যক যে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যখন ব্যক্তিক–সত্তার স্বরূপ সাপেক্ষে তত্ত্ব নির্মাণের দাবি জানানো হয়, সেই সত্তা দ্রব্যরূপ কোনো আধিবিদ্যক পদার্থ নয়। নারীবাদীরা তত্ত্বের অনুষঙ্গে যে ধরনের সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন সেই সত্তা নির্মিত হয় সামাজিক–সাংস্কৃতিক নানাঘাত–প্রতিঘাতে। তাঁরা সত্তার 'হয়ে ওঠা' স্বরূপকে তত্ত্বের প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য তথ্য বা উপাদান হিসাবে মান্যতা দিতে আগ্রহী। মূলস্রোতেও সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত নানা তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে মূলস্রোত বলতে ধ্রুপদী আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনকেই বুঝতে হবে। এইপ্রকার দর্শনে, দার্শনিক নানা তত্ত্ব বা তন্ত্র–কাঠামোতে সত্তার গঠনগত স্বরূপ অনুস্যূত হয়ে থাকে কিনা তা কখনোই আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিক–সত্তার নির্মিত স্বরূপের ভিত্তিতে তত্ত্বভূমি বা তন্ত্র–কাঠামো কীভাবে অনুস্যূত হয়ে থাকে সেই বিষয়ক অনুসন্ধান অবশ্যই একটি নারীবাদী তাত্ত্বিক অন্বেষণের ইঙ্গিতবাহী।

আমরা জানি যেকোনো নারীবাদী অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য হল নারী–পুরুষের লিঙ্গ পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা দূর করে, কীভাবে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তার পথনির্দেশ করা। নারীবাদীরা নানাভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টাও করেছেন। তাঁরা সমস্যাটিকে কখনো আধিবিদ্যক, কখনোও বা জ্ঞানতাত্ত্বিক, কখনো নৈতিক বা যুক্তিবৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য আরোও নানান প্রেক্ষাপট থেকে বিচার–বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলেও, আজও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়নি। সমাজ থেকে লিঙ্গ বৈষম্য আজও দূরীভূত হয়নি। যদিও খানিকটা প্রশমিত হয়েছে একথা অবশ্য স্বীকার্য। এর প্রধানতম কারণ হল লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার পশ্চাতে বিদ্যমান ধ্রুপদী দার্শনিক তত্ত্ব কাঠামোর বিরুদ্ধে নারীবাদীদের পক্ষ থেকে নানা প্রতিবাদী স্বর বা প্রতিস্পর্ধী তাত্ত্বিক চিন্তন কাঠামো গড়ে উঠলেও, সেগুলিকে সুগঠিত করে দর্শনসম্মত কোনো তন্ত্র নির্মাণ এযাবৎ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে কোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে সেই সমস্যাটিকে কোনো না কোনো দার্শনিক তন্ত্র অনুসারে বিচার করা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে সেই বিচার হয় আংশিক, সমস্যারও আংশিক সমাধান হয়, সামগ্রিক সমাধান সম্ভব হয় না। একথা নারীবাদীদের অজানা থাকার কথা নয় যে, মূলস্রোতের কোনো তত্ত্ব-কাঠামোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে তা সামগ্রিকভাবে করাটাই কাম্য, কারণ মূলস্রোতের কোনো তত্ত্বই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে না। সেগুলি সর্বদাই কোনো না কোনো সুসংবদ্ধ তন্ত্রের অংশ হিসাবেই অবস্থান করে, এবং সেই তন্ত্রের অন্তর্গত প্রতিটি তত্ত্বই অপরাপর তত্ত্বের সঙ্গে লগ্ন থেকে একে-অপরের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এহেন তন্ত্রের অন্তর্গত কোনো তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক কাঠামোকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিহত করার অর্থ হল কোনো সমস্যার আংশিক সমাধান, যা দার্শনিক বিচারের লক্ষ্য হতে পারে না। নারীবাদী চিন্তাধারাকে দার্শনিকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে, নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান করতে হলে সেই সমস্যাটিকে একাধারে আধিবিদ্যক-জ্ঞানতাত্ত্বিক-নৈতিক ও যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে পর্যালোচনা করা অপরিহার্য্য।

দর্শনের জগতে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কোনো তত্ত্ব প্রযুক্ত হয় তাদের গঠনগত স্বরূপ যদি তত্ত্বের প্রেক্ষিতে স্থান না পায়, তাহলে সেই তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায়। ধ্রুপদী তত্ত্বে চিন্তার সঙ্গতি লক্ষ করা যায় ঠিকই, কিন্তু তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে কোনোপ্রকার সঙ্গতি সাধন করা সম্ভব হয় না। নারীবাদীরা তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উদ্যোগী। তাই তাঁরা ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ সাপেক্ষে তত্ত্ব নির্মাণে আগ্রহী। এক্ষেত্রে সাপেক্ষতা বলতে সাধারণত লিঙ্গ সাপেক্ষতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। নারীবাদীরা বিভিন্ন সাপেক্ষ প্রেক্ষিত তত্ত্বের অনুষঙ্গে গৃহীত হোক এমনটা চাইলেও, সাপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা চান না। তাঁদের দাবি হল তত্ত্ব যেন সর্বদাই সর্বসাধারণের উপযোগী হয়, কোনও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অনুগামী যেন না হয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত দার্শনিক তন্ত্রের ক্ষেত্রেও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা আবশ্যক।

সমস্যা হল মূলস্রোতে যদিও বিভিন্ন সুগঠিত দার্শনিক তন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, কিন্তু ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে সেই দার্শনিক তন্ত্র কীভাবে সম্পর্কিত হতে পারে সেই বিষয়ক কোনোপ্রকার অনুসন্ধান পরিলক্ষিত হয় না। অপরপক্ষে নারীবাদে ব্যক্তিক-সত্তার

গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকলেও, নেই কোনো সুগঠিত দার্শনিক তন্ত্র–কাঠামো। আছে কেবল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন কিছু ভিন্নধর্মী তাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

উক্ত সমস্যার সমাধানে করণীয় হল প্রথমত, মূলস্রোতের নির্বাচিত দার্শনিক তন্ত্রের ভিত্তিতে অনুমান করতে হবে যে, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিক–সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীরূপ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, নারীবাদের বিভিন্ন ধারায় ব্যক্তিক–সত্তার যে ভিন্ন প্রকার গঠনগত স্বরূপ স্বীকৃত হয়ে থাকে, তার ভিত্তিতে সৃজিত নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের বিন্যাস কীরূপ হতে পারে তার অনুসন্ধানও আবশ্যক।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, 'মূলস্রোত' বলতে মূলত ধ্রুপদী আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনকেই বোঝানো হয়েছে, এবং একইভাবে 'নারীবাদ' বলতে প্রধানত উদারপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই নারীবাদী ধারাকেই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিক–সত্তা বলতে আণবিক ও সম্পর্কিত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনাই একমাত্র অভিপ্রেত, এবং দার্শনিক তন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনার পরিসর বিশেষভাবে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন দার্শনিক প্রদত্ত মতবাদ বা চিন্তাধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বগুলির পর্যাপ্ত আলোচনা ও সমালোচনার ভিত্তিতে যথাযথ বর্ণনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং তুল্যমূল্য বিচারের মাধ্যমে, ব্যক্তিক–সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও তদুপযুক্ত দার্শনিক তন্ত্র–এর প্রকৃতি কীভাবে পরস্পর অনুস্যূত হতে পারে, সেই সম্পর্কটিকে ব্যক্ত করাই মূল লক্ষ্য।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই গবেষণা পত্রের **প্রথম অধ্যায়ে** আলোচিত হয়েছে কান্ট (Immanuel Kant, 1724-1804)–এর দর্শন। তাঁর দার্শনিক তন্ত্র কীভাবে বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় কান্ট প্রবর্তিত তত্ত্বগুলির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তাঁর সমগ্র দার্শনিক তন্ত্রে বিধৃত হয়ে রয়েছে তা তুলে ধরা এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

বিচারবাদী দার্শনিক হিসাবে কান্ট তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি এই দুটি জ্ঞানলাভের উপায়কে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে হয় বুদ্ধি না হয় অভিজ্ঞতা, কোনো একটিকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতাকে তিনি

নির্বিচারবাদ নামে আখ্যায়িত করেছেন। কান্ট তার পূর্বসূরীদের মতবাদকে একদেশদর্শী হিসাবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেন যে, প্রকৃত জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি মনে করতেন জ্ঞান হতে হলে তা সার্বজনীন ও অনিবার্য হওয়া এবং একইসঙ্গে নতুনত্ব বা তথ্য সম্প্রসারণমূলক হওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধির দ্বারা আমরা সার্বজনীনতা ও আবশ্যিকতা লাভ করে থাকি, কিন্তু তা জ্ঞানের সম্প্রসারণে উপযোগী নয় বা তার দ্বারা নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। আর অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা জ্ঞানে নতুন তথ্য সংযোজন করে থাকি, কিন্তু তা আবশ্যিকতা ও সার্বজনীনতা প্রদানে অসমর্থ। তাই কান্ট মনে করেন যে, জ্ঞান উৎপাদনে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়ই অপরিহার্য্য মানব বৃত্তি। তাঁর মতে জ্ঞান মাত্রই তার দুটি দিক থাকে, একটি হল তার উপাদান ও অন্যটি হল তার আকার। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা দেয় জ্ঞানের উপাদান এবং বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকার।

কান্ট তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে মানবমনের অন্যতম দুটি জ্ঞানশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন একটি হল সংবেদনশক্তি এবং অপরটি হল বোধশক্তি। এই সংবেদনশক্তির মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের উপাদান লাভ করে থাকি, যা বহু ও বিচ্ছিন্ন। বাহ্যজগৎ থেকে আগত এইপ্রকার বহু, বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলি সংবেদনশক্তির মাধ্যমে দেশ ও কালের আকারের গ্রথিত হয়ে আমাদের মনে উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভব বা অভিজ্ঞতায় আমাদের এমন কোনো বিষয় প্রত্যক্ষিত হয় না যা কালিক বা দৈশিক নয়। অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রই তা দেশ ও কালে প্রদত্ত হয়ে থাকে। এই দেশ ও কাল হল অভিজ্ঞতার পূর্বশর্ত যা মানব মনের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে। তাই এগুলি যেকোনো অভিজ্ঞতার পূর্বতসিদ্ধ আকার। সংবেদনশক্তির এইরূপ পূর্বতসিদ্ধ আকারের মধ্য দিয়ে বহু, বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলি আমাদের মনে উপস্থিত হয় বলে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অজানা থেকে যায়। এক্ষেত্রে আমরা যা জানতে পারি তা হল বস্তুর অবভাসিত রূপ।

অপরদিকে বোধশক্তির মাধ্যমে আমরা জ্ঞানাকার লাভ করে থাকি। কান্ট বোধশক্তির বারোটি পূর্বতসিদ্ধ প্রকার–এর কথা উল্লেখ করেছেন, যা অভিজ্ঞতালব্ধ যেকোনো বিষয় জ্ঞানের পূর্বশর্ত। ইন্দ্রিয়ানুভব দ্বারা বিষয় উপস্থিত হলে তাতে বৌদ্ধিক প্রকার যুক্ত করে আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি। জ্ঞান হতে গেলে জ্ঞানের বিষয় বা উপাদানগুলিকে বৌদ্ধিক প্রকারের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে হয়। বৌদ্ধিক প্রকারের মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয়কে আকারিত করতে পারলে জ্ঞানক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই বৌদ্ধিক প্রকারগুলি মানবমনের স্বভাব থেকেই উৎপন্ন এবং প্রযুক্ত হয়। বৌদ্ধিক প্রকারগুলি কী উপায়ে ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য বিষয়ে প্রযুক্ত হতে পারে তা

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কান্ট তিন প্রকার সংশ্লেষণ ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন, যথা অনুভবে গ্রাহণিক সংশ্লেষণ, কল্পনায় স্মারণিক সংশ্লেষণ এবং প্রত্যয়ে প্রত্যভিজ্ঞার সংশ্লেষণ। এই তিন প্রকার সংশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে বোধশক্তির একই সংশ্লেষণ ক্রিয়ার তিনটি দিক মাত্র। যেকোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হতে গেলে এই তিনটি সংশ্লেষণ আবশ্যক। এইপ্রকার সংশ্লেষণ লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক যেকোনো ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সংবেদনের আকার ও বৌদ্ধিক প্রকারের সমন্বয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা হল লৌকিক জ্ঞান। এই লৌকিক জ্ঞানই সুসংবদ্ধ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পরিণত হয় বলেই কান্টের অভিমত।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, কান্টের মতানুসারে যথার্থ জ্ঞান মাত্রই তা যুগপৎ তথ্য সংশ্লেষণ মূলক এবং আবশ্যিক তথা সার্বজনীন। এক্ষেত্রে যে জ্ঞান বা অবধারণে নতুন তথ্য সংযোজিত হয় সেই অবধারণের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটে থাকে। কান্ট এইজাতীয় অবধারণকে সংশ্লেষক অবধারণ বলে থাকেন। অপরপক্ষে যে জ্ঞান বা অবধারণের মাধ্যমে আমরা অনিবার্যতা বা সার্বজনীনতা লাভ করি সেগুলিকে কান্ট অভিজ্ঞতা-পূর্ব বা পূর্বতসিদ্ধ অবধারণ বলে অভিহিত করেছেন। কান্টের দর্শনে মূল জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নটি হল উক্তপ্রকার অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ কীভাবে সম্ভব ? এই অনুসন্ধানকে তিনি শুদ্ধ প্রজ্ঞার সাধারণ সমস্যা হিসাবে মনে করতেন। তাই কান্টের উদ্দেশ্য ছিল শুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা শুদ্ধ প্রজ্ঞার ক্ষমতা বিচার করে মানুষ কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ তার সীমানা নির্ধারণ করা। বিজ্ঞান বা গণিতে পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান যে সম্ভব এই বিষয়ে কান্টের মনে কোনো সংশয় ছিল না। তিনি নানান উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান কীভাবে সম্ভব।

আধিবিদ্যক আলোচনায় কান্ট দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, তথাকথিত আধিবিদ্যক বিষয়সমূহ সম্পর্কে পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান তো বটেই, এমনকি কোনোপ্রকার জ্ঞানলাভ করাই সম্ভব নয়। এতদ সত্ত্বেও কান্ট লক্ষ করেন যে, অধিবিদ্যার অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা বাদ-বিতন্ডার কোনো শেষ নেই। এর কারণ হিসাবে তিনি মানুষের বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা বা ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধিক জীবের স্বভাবই এমন যে, তারা আধিবিদ্যক প্রশ্ন উত্থাপন না করে থাকতে পারে না। এইজাতীয় প্রশ্নের কারণ হল 'অতীন্দ্রিয় ভ্রান্তি'। তাই কান্ট মনে করেন বিজ্ঞানের মত করে না হলেও, অন্তত মানব মনের সহজাত ধর্ম বা প্রবণতা হিসাবে অধিবিদ্যার চর্চা অর্থহীন নয়। তাঁর মতে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গম্য লৌকিক বিষয় সম্বন্ধে

জ্ঞানলাভ করতে পারলেই মানুষের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় এমন নয়। মানবমন এর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ সমূহকেও জানতে চায়। লৌকিক বা প্রাকৃত জ্ঞানে আমরা যা পাই তা হল কতকগুলি শর্তাধীন, সীমিত ও খন্ডিত বিষয়সমূহ। এতটুকু জানাটাই মানুষের কাছে যথেষ্ট নয়। তাই সে উক্তপ্রকার জ্ঞানের অন্তরালে যে শর্তহীন, অসীম, অখন্ড পদার্থ বিদ্যমান থাকে তার অন্বেষণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চায়।

কান্ট মনে করেন যে, শর্তহীন অখণ্ড সমগ্র বলে কিছু একটা আছে ধরে নিয়ে আমরা অগ্রসর হই বলেই সেটি আমাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না, বরং তা জ্ঞানের দিগ্দর্শনে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে প্রজ্ঞার দ্বারাই আমরা জ্ঞানের দিগ্দর্শনের ধারণা লাভ করে থাকি বলেই কান্টের অভিমত। সুতরাং যা শুধুমাত্র প্রজ্ঞাপ্রসূত ধারণা, সেটিকে যদি আমরা জ্ঞানের বিষয় হিসাবে ধরে নিয়ে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হই তাহলেই অতীন্দ্রিয় ভ্রমের সৃষ্টি হয়। কান্টের মতে বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়ানুভব গম্য শর্তাধীন, খণ্ডিত, ও সীমিত বিষয়ের দিগ্দর্শক হিসাবে যেমন ইন্দ্রিয়াতীত শর্তহীন সমগ্রের ধারণা অপরিহার্য্য। তেমনি মনোজগতেও শর্তাধীন, খন্ডিত, ও সীমিত যাবতীয় আন্তর অবভাসের মূলে উক্তপ্রকার শর্তহীন সমগ্রের ধারণা অবশ্য স্বীকার্য। মনোজগতের ক্ষেত্রে সেই ইন্দ্রিয়াতীত শর্তহীন সমগ্র হল আত্মা, বাহ্যজগতের ক্ষেত্রে তা হল বিশ্ব, এবং ওই উভয় জগৎ নির্বিশেষে যাবতীয় সত্তার মূল হিসাবে যে শর্তহীন সমগ্রের কথা আমরা চিন্তা করে থাকি তা হল ঈশ্বর। কান্ট নানান যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলি সম্পর্কে আধিবিদ্যক চর্চা যে অর্থহীন নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি উক্তপ্রকার পদার্থগুলিকে জ্ঞান পদবাচ্য হিসাবে স্বীকার করেন না ঠিকই, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে কোনো ধারণা গঠন করা বা চিন্তা করার মধ্যে কোনোরকম অসুবিধা আছে বলে তিনি মনে করেন না। কারণ লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিগ্দর্শনের ক্ষেত্রে উক্ত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সমূহের ভূমিকা অপরিসীম।

কান্ট মনে করতেন বিজ্ঞানের জ্ঞানটাই সব নয়, বিজ্ঞান ছাড়াও মানুষ ধর্ম বা নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী। এইপ্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস বা নৈতিকতার স্বীকার্য সত্যগুলোকে আমরা আধিবিদ্যক অনুসন্ধানের ফলেই লাভ করে থাকি। তাই অধিবিদ্যার চর্চা অপরিহার্য্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরতা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার না করলে মানুষের ব্যবহারিক বা নৈতিক জীবন অচল হয়ে পড়বে। শুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে গেলে অতীন্দ্রিয় ভ্রান্তির শিকার হতে হয়, সেই একই বিষয় ব্যবহারিক প্রজ্ঞার

দ্বারা নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই ব্যবহারিক প্রজ্ঞাই হল নৈতিকতার উৎসস্থল।

নৈতিকতা প্রসঙ্গে কান্ট মানুষের বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিটি মানুষ তার ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা এইসমস্ত বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিগুলিকে সংগতিপূর্ণভাবে বিষয়নিষ্ঠ কর্মনীতিতে পরিণত করতে পারে, যা কিনা সার্বিক। অর্থাৎ যেকোনো ব্যক্তি সেই নীতি অনুসরণ করে কাজ করতে পারবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই নীতিগুলি বাহ্য-আরোপিত নয়, এগুলো স্ব-আরোপিত নৈতিক আদেশ, যা অনুজ্ঞা নামে খ্যাত।

উক্তপ্রকার নৈতিক অনুজ্ঞা দুই প্রকার শর্তহীন ও শর্তাধীন। নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে কান্ট শর্তহীন নৈতিক অনুজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ঔচিত্যের বিষয়টি শর্তহীনভাবে আরোপিত হয়, সেখানে আমরা বিষয়ীনিষ্ঠ ইচ্ছার পরিবর্তে বুদ্ধির আদেশের দ্বারা পরিচালিত হই। কান্ট নিঃশর্ত বা শর্তহীন অনুজ্ঞার দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নিঃশর্ত অনুজ্ঞা হবে সার্বিক। অর্থাৎ তা সবার ক্ষেত্রে বিধিরূপে প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয়ত, তা আবশ্যিক হবে অর্থাৎ এর কোনো ব্যতিক্রম থাকবে না। নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝায় সেই প্রসঙ্গে কান্ট পাঁচ প্রকার সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

১) The Formula of Universal Law (সার্বিক নিয়মের সূত্র) :

এই সূত্র প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত এমন এক কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করা যেটিকে সে একইসঙ্গে একটি সার্বিক নিয়মে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন কোনো একটি বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতি অনুসরণ করে কাজ করে, তখন একইসঙ্গে সে যেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করতে পারে যে, তার ওই বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিটি একটি সার্বিক নিয়মে পরিণত হোক। সেক্ষেত্রে শর্তহীন অনুজ্ঞায় উন্নীত হওয়ার জন্য বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতির স্ববিরোধহীন সার্বিকীকরণ আবশ্যক।

২) The Formula of The Law of Nature (প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র) :

এই সূত্র প্রসঙ্গে কাণ্ট বলেছেন যে নৈতিক নিয়মগুলি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেই তা শর্তহীন অনুজ্ঞা হবে এমন নয়। নৈতিক নিয়মগুলি তখনই শর্তহীন অনুজ্ঞা হয়ে ওঠে যখন সেগুলির প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় গ্রহণযোগ্যতা থাকে। আমরা জানি সম-অবস্থায় সম-আচরণ

করাই হল প্রাকৃতিক নিয়মের বৈশিষ্ট্য। নৈতিক নিয়মগুলি যদি এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাহলে জনমানসে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

৩) The Formula of The End in Itself (স্বতঃলক্ষ্যাভিমুখী সূত্র) :

এই সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কান্ট বলেছেন প্রত্যেক মানুষের এমনভাবে কাজ করা উচিত যেখানে সে নিজেকে বা অন্য কোনো মানুষকে শুধুমাত্র সাধন হিসাবে গ্রহণ না করে সকল সময়ই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। কান্ট মনে করেন প্রতিটি মানুষই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান, তাই কোনো মানুষকে কখনোই নিছক লক্ষ্যপূরণের বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁর মতে প্রতিটি যৌক্তিক জীব নিজেই নিজের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৪) The Formula of Autonomy (স্বাতন্ত্র্যের সূত্র) :

নিঃশর্ত অনুজ্ঞার এই সূত্র প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের এমন একটি কর্মনীতি অনুসরণ করে কাজ করা উচিত যা তার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত। তাঁর মতে কোনো মানুষ যখন ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে ইচ্ছার স্বাধীনতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, কেবলমাত্র কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করে, তখনই তার সেই কর্মনীতিটি সার্বিক নিয়মে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা যুক্ত হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে উন্নীত হলেই তা নিঃশর্ত অনুজ্ঞায় পরিণত হয়।

৫) The Formula of The Kingdom of Ends (লক্ষ্যের সাম্রাজ্যের সূত্র) :

এই সূত্র থেকে জানা যায় যে, কান্ট প্রতিটি মানুষকে এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কথা বলেছেন যা হবে কেবলমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য–এর সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের একটি আবশ্যিক মাত্রা হল, এখানে প্রতিটি সদস্য নিজেকে এবং একে-অপরকে কখনোই নিছক উপায় হিসাবে ব্যবহার না করে সর্বদাই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে 'লক্ষ্যের সাম্রাজ্য' বলতে সেই ধরনের সাম্রাজ্যকেই বোঝানো হয়েছে যেখানে বসবাসকারী প্রত্যেক সদস্যই নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদন করে। এইরূপ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল ব্যক্তিই স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন, তাই তারা নৈতিক নিয়মের প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধাশীল।

যুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কিত কান্টের অভিমত ব্যক্ত করতে হলে তাঁর 'অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞান'–এর আলোচনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। কান্ট ধ্রুপদী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানকে অস্বীকার করেননি, বরং যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত এক নতুন ধারণা উদ্ভাবন করাই ছিল তার

অভিপ্রায়। কান্টের এইরূপ অভিপ্রায়ের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে ধ্রুপদী আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিজ্ঞানের সঙ্গে কান্ট প্রবর্তিত অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞানের পার্থক্য অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। বোধশক্তির যে সমস্ত প্রকার অনুভবগম্য উপাদানের প্রতি প্রযুক্ত হলে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেই অভিজ্ঞতা–পূর্ব প্রকারগুলির প্রকৃতি, সেগুলির ক্রিয়াক্রম এবং যথার্থতা সংক্রান্ত আলোচনাকে কান্ট 'অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেছেন।

ধ্রুপদী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল চিন্তার শুদ্ধ অনিবার্য নিয়ম বা আকার। এটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের চিন্তন এবং বুদ্ধিলব্ধ বিমূর্ত ধারণা গঠন উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো চিন্তা, বিশ্লেষক বা সংশ্লেষক এবং অভিজ্ঞতা–পূর্ব বা পরতসাধ্য যাই হোক না কেন, তা সর্বদাই চিন্তন নিয়মের অনুগত। এইপ্রকার যুক্তিবিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যেকোনো জ্ঞানের আকারকে, উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিমূর্ত রূপটিকে আবিষ্কার করা।

কান্ট বোধশক্তির অভিজ্ঞতা–পূর্ব প্রকার বা প্রত্যয়গুলিকে ধ্রুপদী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন অবধারণ বা বচন সাপেক্ষে গড়ে তুলেছেন বলেই দাবি জানিয়েছেন, যেগুলি কিনা আমাদের সমস্ত প্রকার চিন্তা বা জ্ঞানের অভিজ্ঞতা–পূর্ব বচন বা অবধারণ। পার্থক্য হল এই যে, আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল অনুভব নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ চিন্তনের আকার বা নিয়ম, কিন্তু কান্টের অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞানে বৌদ্ধিক প্রকাররূপ চিন্তনের শুদ্ধ নিয়ম বা আকারের সঙ্গে অনুভবের বিষয়ও যুক্ত হয়ে থাকে। কারণ তাঁর মতে বৌদ্ধিক প্রকারগুলি শুধুমাত্র অনুভবগম্য পদার্থেই প্রযুক্ত হতে পারে, অন্যথা নয়। এক্ষেত্রে বোধশক্তির অভিজ্ঞতা–পূর্ব প্রত্যয় বা অবধারণের সঙ্গে অনুভবলব্ধ পদার্থের সংযোগ ঘটে থাকে বলে, আমরা এমন জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হই যা যুগপৎ অভিজ্ঞতা–পূর্ব এবং সংশ্লেষক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল হিউম (David Hume, 1711-1776)–এর দর্শন। একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে হিউম কীভাবে দর্শনের বিভিন্ন শাখা–প্রশাখা সম্বন্ধে নিজমত ব্যক্ত করেছেন তা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর দার্শনিক তন্ত্রটিকে প্রকাশ করা এই আলোচনার প্রধান উপজীব্য।

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে হিউম এক অভিনব তত্ত্বের প্রবক্তা। আমরা জানি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন বহির্জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানলাভের

একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা হল আসলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগতে অবস্থিত বিষয়গুলিকে স্পর্শ করা। ফলত এটা সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা লাভের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হলেও, এই প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

প্রসঙ্গত হিউম মনে করেন আমাদের অভিজ্ঞতা লাভের যে প্রক্রিয়া তার দুটি ধাপ বা পর্যায় আছে। একটি হল 'মুদ্রণ' এবং অপরটি হল 'ধারণা'। যখন কোনো বহির্জাগতিক উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে তখন সেই ইন্দ্রিয় যা গ্রহণ করে সেটাই হল মুদ্রণ। এই মুদ্রণের পরবর্তী পর্যায় হল ধারণা। মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগ আবশ্যক, কিন্তু ধারণার উৎপত্তির ক্ষেত্রে কোনো ইন্দ্রিয় সংযোগের আবশ্যকতা থাকে না। মুদ্রণই ধারণার পূর্বশর্ত বা কারণ। মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হতে পারে না। যার মুদ্রণ হয়নি তার ধারনা গঠন করা অসম্ভব। আবার যার মুদ্রণ যথাযথ হয়নি, তার ধারণা ও যথাযথ হতে পারে না। মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুদ্রণ হল বস্তুর প্রাণবন্ত ও স্পষ্ট রূপ এবং ধারণা হল এমন যা মুদ্রণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট এবং কম প্রাণবন্ত। প্রকৃতপক্ষে ধারণা হল মুদ্রণের অস্পষ্ট ও ক্ষীণ প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধরা যাক আমরা একটি সাদা ফুল দেখছি। ওই সাদা ফুলের সঙ্গে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সংযোগ হয়, তখন ওই ফুলের যে ইন্দ্রিয় উপাত্ত আমাদের মনের মধ্যে আসে তাই হল মুদ্রণ। পরবর্তীকালে যখন ওই বহির্জাগতিক সাদা ফুলটি থাকে না বা তার সঙ্গে আমাদের কোনো ইন্দ্রিয় সংযোগ থাকে না, তখন ওই সাদা ফুলটির যে স্মরণ বা কল্পনা হয় সেটাই হল ধারণা। এক্ষেত্রে যেকোনো ধারণা যেকোনো মুদ্রণ থেকে গড়ে উঠতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রতিটি ধারনাই তার আনুষঙ্গী মুদ্রণ থেকেই উৎপন্ন হয়। তাই মুদ্রণ হল ধারণার আবশ্যিক শর্ত। যে সার্বিক নীতিগুলির দ্বারা ধারণা সমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়, হিউম সেই সার্বিক নীতিগুলিকেই ধারণার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে কেবলমাত্র তিনটি অনুষঙ্গ নীতি বা সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল সাদৃশ্য, সান্নিধ্য এবং কার্য–কারণ সম্পর্ক।

হিউম মানুষের সকল জ্ঞানের বিষয় বা অনুসন্ধানের বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন সেগুলি হল ধারণার সম্বন্ধ এবং বস্তুস্থিতি। তাঁর মতে বস্তুস্থিতি বিষয়ক সকল যুক্তি উক্তপ্রকার কার্য–কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতেই প্রদত্ত হয়ে থাকে। এই কার্য–কারণ সম্পর্কের জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ যুক্তির সাহায্যে লাভ করা যায় না। এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না, যা থেকে আমরা

জানতে পারবো যে এই জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ। তাই তিনি স্বীকার করেন যে, কার্য–কারণ সম্পর্কের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত হয়, সুতরাং এই জ্ঞান হল পরতঃসাধ্য। যখন আমরা লক্ষ করি কোনো বিশেষ বিশেষ বস্তু একে–অপরের সঙ্গে নিয়তই সংযুক্ত হয়ে থাকে, তখন তাদের মধ্যে কার্য–কারণ সম্পর্কের জ্ঞান আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারাই লাভ করে থাকি। পূর্ব অভিজ্ঞতায় আমরা যে কারণ থেকে যে কার্যকে নিঃসৃত হতে দেখেছি, প্রত্যাশা করি যে সেই কারণ থেকে পুনরায় সদৃশ কার্য উৎপন্ন হবে। হিউমের মতে এইরূপ প্রত্যাশার মূলে যে নীতিটি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে তা হল আমাদের মানসিক প্রবণতা বা অভ্যাস। অভিজ্ঞতায় একই ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করে আমাদের মনে একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে যার জন্য আমরা সদৃশ কারণ দেখলে সদৃশ কার্যকে প্রত্যাশা করি। এইরূপ প্রত্যাশা মানুষের অভ্যাসের পরিণতি। তাই বলা যেতে পারে যে, বাস্তব অস্তিত্ব বা বস্তুস্থিতি সম্পর্কিত আমাদের যে বিশ্বাস তার মূলে রয়েছে এই অভ্যাস বা অভ্যাসজাত প্রত্যাশা। এক্ষেত্রে কোনো দুটি বস্তুস্থিতি বা ঘটনার মধ্যে সংযোগ লক্ষ করে যখন পুনরায় সংযোগের প্রত্যাশা মনে জাগে তখনই অনিবার্যভাবে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভালোবাসা ও ঘৃণার মতো বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়াটাও মনের একপ্রকার স্বাভাবিক বৃত্তি বা প্রবণতা। তাই হিউম বলেন যে, আবেগ ও অনুভূতির সত্য ও যথার্থ নামই হল বিশ্বাস। এরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে নিছক কল্পনার পার্থক্যকরণ আবশ্যক।

অধিবিদ্যা সম্পর্কিত হিউমের মত আলোচনার পূর্বে তিনি দার্শনিক অনুসন্ধানের ধরনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। হিউম মনে করেন যে, অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সমগ্র দর্শন তথা দার্শনিক আলোচনাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, একটি হল 'সহজ ও সুস্পষ্ট দর্শন' এবং অপরটি হল 'নিগুঢ় বা অস্পষ্ট দর্শন'। প্রথম প্রকার দর্শনে মানুষকে মূলত কর্মপ্রবণ জীব হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ তার রুচি ও আবেগ অনুসারে কোনো বস্তুকে গ্রহণ বা বর্জন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এইপ্রকার দর্শনে মানুষের সততা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয়। যেকোনো আলোচ্য বিষয়কে এক্ষেত্রে অতি স্পষ্ট ও সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। মানুষ যাতে সততা ও অসততার পার্থক্যকে অনুভব করতে পারে, এবং সৎ ও সম্মানজনক পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করার মধ্য দিয়ে তাদের কর্মজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে প্রয়াসী হয়, তার পথনির্দেশ করাই এইপ্রকার দর্শনচর্চার মূল লক্ষ্য।

অপরপক্ষে দ্বিতীয় প্রকার দর্শনচর্চায় মনে করা হয় যে, মানুষ হল চিন্তাপ্রবণ জীব। চিন্তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে অধিকতর যৌক্তিক করে তোলা এই ধরনের দর্শনচর্চার মূল উদ্দেশ্য। মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করার কোনো অভিপ্রায় এইপ্রকার দর্শনে পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানের বিষয় হল সেই সব মৌলিক নীতি যা মানুষের আচরণ, তার আবেগ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই দর্শনের আলোচ্য বিষয় কোনো মূর্ত পদার্থ নয়। বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে বিমূর্ত ধারণা বা প্রত্যয় গঠন করাই এইজাতীয় দর্শনচর্চার অভিষ্ঠ লক্ষ্য। সেই কারণে সাধারণ জনমানসে এই দর্শন নিগুঢ়ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়। হিউম চিরাচরিত আধিবিদ্যক পর্যালোচনাকে এইপ্রকার দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

সাধারণ মানুষের কাছে নিগুঢ় বা অস্পষ্ট দর্শন অপেক্ষা সহজ ও স্পষ্ট দর্শন অধিকতর জনপ্রিয় ও প্রয়োজনীয় হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। যদিও হিউম মনে করেন যে, উক্ত দুই প্রকার দর্শনের মধ্যবর্তী অবস্থানটাই মানুষের পক্ষে কাম্য। কারণ এমন নয় যে, মানুষ হয় জ্ঞানপিপাসু, না হয় সে কর্মপ্রবণ। সুতরাং জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের মিলন আবশ্যক। এইকারণে হিউম অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুসন্ধানকে প্রাধান্য দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু দর্শনে অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণত অস্বীকার করেননি। সেক্ষেত্রে তিনি অধিবিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, একটি হল যথার্থ অধিবিদ্যা এবং অপরটি হল ভ্রান্ত অধিবিদ্যা। তিনি মনে করতেন অধিবিদ্যা মাত্রই তা সামগ্রিকভাবে বর্জনীয় বা নিন্দনীয় নয়। এক্ষেত্রে তিনি ভ্রান্ত অধিবিদ্যার পরিবর্তে যথার্থ অধিবিদ্যার চর্চার কথা বলেছেন। হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে এমন কিছুকে স্বীকার করেন না, যেখানে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়কে জানতে চাওয়া হয়। এইজাতীয় অধিবিদ্যাকে তিনি অনিশ্চয়তা ও ভ্রান্তির উৎস হিসাবে গণ্য করেন এবং সেটিকে মানুষের (দার্শনিক) বৌদ্ধিক অহমিকার ফসল হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি আরো বলেন যে, উক্ত অধিবিদ্যার চর্চায় ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়কে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে কু-সংস্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়। যুক্তির দ্বারাই এই সমস্ত কু-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয় বলেই তিনি মনে করেন, এবং এইপ্রকার যুক্তিকে অপযুক্তি হিসাবে অভিহিত করেন। হিউম বিশ্বাস করেন যে, অধিবিদ্যা এযাবৎ কোনো নিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান দিতে না পারলেও, এমন ভাবাটা সঙ্গত হবে না যে, অধিবিদ্যার আলোচনা নিষ্ফল।

হিউম সুসংবদ্ধভাবে কোনো নৈতিক তত্ত্ব প্রদান করেননি, কিন্তু নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে বাহ্যজগতকে আমরা যেমন অভিজ্ঞতার

মাধ্যমে জানতে পারি, একইভাবে মানব প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত যে নৈতিক জগৎ সেটিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা সম্ভব। হিউম মনে করতেন নৈতিকতার মূল লক্ষ্য হল মানুষের জীবনের ভালো-মন্দ, উচিত–অনুচিত ইত্যাদি মূল্যগুলিকে নিরূপণ করা। তিনি নৈতিকতা বলতে বুঝতেন এমন এক অনুভূতিকে যা সকল মানুষের মধ্যে একইভাবে নিহিত থাকে, এবং নৈতিক মূল্যায়ন বলতে বোঝেন কোনো বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির মনে অনুমোদন বা অননুমোদনের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়াকে। এই নীতি অনুসরণ করে কোনো কাজকে তখনই ভালো বলা যাবে, যখন তা কোনো ব্যক্তির মনে অনুমোদনের অনুভূতির সৃষ্টি করবে এবং কোনো কাজকে তখনই মন্দ বলা হবে, যখন তা কোনো ব্যক্তির মনে অননুমোদনের অনুভূতি সৃষ্টি করবে। হিউম প্রবর্তিত নৈতিক চিন্তায় সুখ ও উপযোগিতা একই পর্যায়ভুক্ত এবং নৈতিক আবেগ, অনুভূতি বা ভাবাবেগকে একই অর্থে বুঝতে হবে। তিনি নৈতিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধি অপেক্ষা নৈতিক আবেগকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এইস্থলে তিনি আবেগ বলতে ব্যক্তিসাপেক্ষ যে আবেগ, যা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়, শুধুমাত্র সেইজাতীয় আবেগ বা অনুভূতির কথা বোঝাতে চাননি। হিউমের নৈতিক চিন্তায় স্বীকৃত আবেগ হল সেই আবেগ যা সকলের মধ্যে একইভাবে বিদ্যমান। যার দ্বারা গঠিত নৈতিক মানদন্ড হয়ে উঠবে সার্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক।

হিউম নৈতিক প্রেক্ষাপটে নৈর্ব্যক্তিকতা বা সার্বজনীনতার দাবি জানালেও, তা কীভাবে লাভ করা যাবে সেই ব্যাপারে যুক্তির ভূমিকাকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর মতে যুক্তি হল আবেগের অধীনস্থ দাস এবং সেইরূপেই তার থাকা উচিত। এইস্থলে তিনি যুক্তি অপেক্ষা মানুষের বিশ্বাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নৈতিকতা প্রসঙ্গে হিউমের অভিমত তার মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসই সেক্ষেত্রে অধিক নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এই বিশ্বাসের মূলে আছে মানুষের অনুভূতি। তাই আবেগ–অনুভূতিকেই তিনি মানুষের নৈতিক বোধের প্রধান উৎস হিসাবে মনে করতেন।

যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় হিউম আরোহমূলক সমস্যার প্রতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কাছে যুক্তিবিজ্ঞান হল ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান। তা কখনোই অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান নয়। অন্যদিকে আরোহমূলক যুক্তি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। হিউমের মতানুসারে আরোহমূলক যুক্তির মাধ্যমে আমরা যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা কখনোই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ভবিষ্যৎ সর্বদাই অতীত এবং বর্তমানের অনুরূপ

হবে। হিউম মনে করেন অভিজ্ঞতার দ্বারা কখনোই সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আমরা দাবি করতে পারি না যে, কোনো একটি ঘটনা অতীত ও বর্তমানে যেভাবে ঘটেছে ভবিষ্যতেও তা একইভাবে ঘটবে। কারণ যে বাস্তব তথ্য ভিত্তির উপর নির্ভর করে আরোহমূলক যুক্তির মাধ্যমে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা সর্বদাই অতীত ও বর্তমানকালীন হয়। তার দ্বারা কখনোই ভবিষ্যতের বস্তুস্থিতিকে যুক্তিযুক্ত করে তোলা যায় না। এই প্রসঙ্গে হিউমের দাবি হল, অতীত ও বর্তমানকালীন কোনো ঘটনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের বস্তুস্থিতি সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তা কোনো যুক্তির উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে মানব প্রকৃতিতে নিহিত একপ্রকার নীতির উপর। সেগুলিকে তিনি প্রথা বা অভ্যাস নামে অভিহিত করেছেন। একই কারণে হিউম কার্যও কারণ–এর মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকার করেন না। তাঁর মতে কার্য–কারণ হল প্রকৃতপক্ষে দুটি ঘটনার মধ্যে সতত সংযোগ। ফলত হিউমের দর্শনে সম্ভাব্যতা ও সংশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। হিউমের যুক্তিবিজ্ঞান হল একাধারে বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক এবং আদর্শমূলক। কারণ এখানে যুক্তি কীভাবে চালিত হয়ে থাকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়, যুক্তি কেনই বা এভাবে চালিত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়, এবং যুক্তি কীভাবে চালিত হওয়া উচিত তা নির্দেশ করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হল এক উদারপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের অন্বেষণ। উদারপন্থী নারীবাদে নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনাগুলিকে সমন্বিত করার মধ্য দিয়ে, কীভাবে একটি তন্ত্রিত বা প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা গঠিত হতে পারে, তার যথাযথ ব্যাখ্যাদান করাই এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

নারীবাদ সম্মত যেকোনো চিন্তা-ভাবনায় লিঙ্গ প্রেক্ষিত যুক্ত হয়ে থাকাটা অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য। নারীবাদী দর্শন এর ব্যতিক্রম নয়, লিঙ্গ প্রেক্ষিতের বিদ্যমানতা নারীবাদী দর্শন বা দার্শনিক চিন্তাধারাকে অনন্যতা দান করে থাকে। এককভাবে দর্শনের কোনো শাখা বা সমগ্র দার্শনিক তন্ত্র যাই হোক না কেন, সর্বত্রই লিঙ্গ প্রেক্ষিতের উপস্থিতি লক্ষণীয় একটি বিষয়। নারীবাদী দর্শনে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা কীভাবে তন্ত্রিত হয়ে থাকতে পারে তা বুঝতে হলে অধিবিদ্যা–জ্ঞানতত্ত্ব–নীতিবিদ্যা এবং যুক্তিবিজ্ঞানের সমন্বয়ে তার উপস্থাপনা একান্ত আবশ্যক।

নারীবাদী অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত কোনো পদার্থ নয়। নারীবাদীরা জানতে চান যে, জগতে লিঙ্গ প্রেক্ষিত অস্তিত্বশীল কিনা বা মানুষের কোন্ পরিচয় তার সত্তাগত

স্বরূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারপন্থী নারীবাদীরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের তিনটি পরিচয় স্বীকার করেন। প্রথমটি হল তার যৌন পরিচয় যা শারীরিকভাবে নির্ধারিত, দ্বিতীয়টি হল লিঙ্গ পরিচয় যা সামাজিকভাবে আরোপিত এবং তৃতীয় পরিচয়টি হল সে মানুষ। উদারপন্থী নারীবাদীরা মানুষের যৌন ও লিঙ্গ পরিচয়কে সাপেক্ষ পরিচয় হিসাবে মনে করেন, কিন্তু এর অতিরিক্ত যে মানুষ, তার নেই কোনো সাপেক্ষ পরিচয়। আছে কেবল অনপেক্ষ মানবধর্ম, যুক্তি যার মূল চালিকা শক্তি। এই মানবধর্ম অনুযায়ী মানুষ হল যৌক্তিক জীব। এইপ্রকার অনপেক্ষ পরিচয় অতিরিক্ত অন্য কোনো সাপেক্ষ পরিচয় যেন তত্ত্বের প্রেক্ষিতে স্থান না পায়, বা তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তকে যেন প্রভাবিত করতে না পারে, সেই বিষয়ে সদা সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। উদারপন্থী নারীবাদীরা বিশুদ্ধ যুক্তির ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মাণে আগ্রহী এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যেকোনো তত্ত্ব বিশুদ্ধ যুক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফলত তত্ত্ব কখনোই সাক্ষাৎভাবে লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ পক্ষপাত বা লিঙ্গ রাজনীতির ধারক বা বাহক হতে পারে না। সেক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপটে যদি লিঙ্গবৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাহলে বুঝতে হবে হয় বিশুদ্ধ যুক্তি তার ধর্ম পালনে ব্যর্থ হয়েছে, অথবা তত্ত্বটির ভ্রান্ত প্রয়োগ ঘটেছে। এটিকে তাঁরা তত্ত্বের 'অনবধান দোষ' হিসাবে দেখতে চান, যার কারণ হল ক্ষমতার রাজনীতি। সুতরাং এই মতানুসারে তাত্ত্বিক স্তরে কোনো লিঙ্গ সমস্যা থাকতে পারে না, থাকে প্রয়োগের স্তরে। এহেন পরিস্থিতিতে তাঁরা লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে নারীর যাপিত অভিজ্ঞতাকে জুৎসই তত্ত্বের পরিধিতে স্থান দেওয়ার পন্থা হিসাবে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পটিকে নির্বাচন করেন। সেই কারণে উদারপন্থী নারীবাদীরা প্রচলিত তত্ত্বের আমূল সংস্কার চান না, তত্ত্বের পুনর্নির্মাণ-এ আগ্রহী।

দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ জানাটা কেন প্রয়োজন তা বুঝতে হলে ব্যক্তিক-সত্তা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে সেই সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা আবশ্যক। জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় সত্তার বিষয়ীগত কোনো ধর্ম বা স্বরূপ আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা, বা সেটি আদৌ কাম্য কিনা, তা একটি ভিন্ন প্রশ্ন। এইস্থলে বিচার্য বিষয় হল আপাত বিষয়নিষ্ঠতার আড়ালে কোনো বিষয়ীনিষ্ঠ প্রেক্ষিত জড়িয়ে থাকতে পারে কিনা ?

ধ্রুপদী জ্ঞানতত্ত্বে 'যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস'-কে জ্ঞান বলা হয়। এই মতানুসারে কোনো বিষয়কে (বচনকে) যদি জ্ঞান পদবাচ্য হতে হয় তাহলে সেই বিষয়টিকে সত্য হতে হবে,

বিষয়টির সত্যতার প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে, এবং ওই বিশ্বাসের সমর্থনে পর্যাপ্ত যুক্তিসিদ্ধি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকতে হবে। এই আবশ্যিক শর্তগুলি পূরণের মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান পাওয়া যাবে তা হবে বিষয়নিষ্ঠ। সেখানে কোনোপ্রকার জ্ঞাতানির্ভর প্রেক্ষিত থাকতে পারে না। উদারপন্থী নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিকরা উক্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁরা দাবি করেন জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে যে ধরনের বিষয়নিষ্ঠতার দাবি করা হয়, যা কিনা জ্ঞাতার সর্বপ্রকার সাপেক্ষ প্রেক্ষিত ব্যতিরেকে রচিত বলে মনে হয়, সেটি আসলে পুরুষের সামাজিক প্রেক্ষিত নির্ভর অবস্থান। সুতরাং এইস্থলে আসলে বিষয়নিষ্ঠতা নয়, তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় বিষয়করণতা। এই বিষয়করণতা হল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এবং পুরুষের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গে ল্যাংটন (Rae Helen Langton, 1961-) সত্য বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠার নেপথ্যে যে বাস্তব চিত্র আছে, তা আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল, যেকোনো বিশ্বাসের লক্ষ্য হল সত্য হওয়া, এবং সেগুলি তখনই সত্য হয়ে উঠবে যখন তা জগতে খাপ খাবে। অপরদিকে যেকোনো কামনা–বাসনার লক্ষ্য হল পূর্ণতা লাভ করা, এবং সেগুলি তখনই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন জগৎ সেগুলিতে খাপ খায়। অর্থাৎ বিশ্বাস জগতে খাপ খাবে এবং জগৎ কামনা-বাসনাতে খাপ খাবে এটাই হল খাপ খাওয়ার স্বাভাবিক অভিমুখ, কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে, জগৎ খাপ খায় বিশ্বাসের সঙ্গে এবং বিশ্বাস খাপ খায় কামনা–বাসনার সঙ্গে। যেমন কোনো বিশ্বাস যদি ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিশ্বাস হয় তাহলে সে তার কামনা–বাসনার অনুকূলেই নিজের বিশ্বাস গড়ে তোলে, এবং জগৎ খাপ খেয়ে যায় শক্তিমানের সেই বিশ্বাসের সঙ্গে। সুতরাং এইপ্রকার খাপ খাওয়ার প্রক্রিয়াটি যেহেতু সাপেক্ষ প্রেক্ষিত বা পরিস্থিতি দ্বারা পরিচালিত, তাই এটি কখনোই যথার্থ হতে পারে না। এইপ্রকার বিষয়নিষ্ঠতাকে ল্যাংটন ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’ নামে অভিহিত করেছেন।

উদারপন্থী নারীবাদীরা যেহেতু লিঙ্গ অনপেক্ষ মানবধর্মের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মাণ হওয়া উচিত বলে মনে করেন, তাই নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিক তত্ত্বের অনুগামী। কারণ তাঁরা মনে করেন সামাজিক ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। ধ্রুপদী ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলির নিরিখে বলা যায় যে, ন্যায়নিষ্ঠতা হল এমন এক নৈতিক সদগুণ বা নীতি যার দ্বারা সকল মানুষ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য লাভ করতে পারে। এইরূপ নৈতিকতার উদ্দেশ্য হল যথাযথ বন্টনরূপ নৈতিক নীতি প্রদান করা, যার দ্বারা সমাজ-সভ্যতার

বিবিধ উপকরণের সঠিক বন্টন সম্ভব হয়ে উঠবে। নারীবাদীরা এক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক অবস্থানের বৈষম্যের বিষয়টিকে সর্বপ্রথম উত্থাপিত করে থাকেন। তাঁদের যুক্তি হল নারীর অধীনতা কোনো জন্মগত নিয়তি নয়, বরং এটি হল সামাজিক স্তরায়নের প্রাতিষ্ঠানিকরণের ফল। এই প্রসঙ্গে তাঁরা যৌন পার্থক্যের সঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক স্তরায়নের সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় তুলে ধরে দাবি করেন যে, যা ব্যক্তিগত তা রাজনৈতিক। কারণ ক্ষমতার রাজনীতি নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে সমভাবেই পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে। এইস্থলে নারীবাদীরা যৌন সাম্যের আদর্শ ও যৌন পার্থক্যের আপাত বাস্তবতার মধ্যে নিহিত যে উদ্বেগ, তার ঊর্ধ্বে উঠে, সমাজে নারীর সাম্যাবস্থা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লিঙ্গ সাম্যের উপায় ও লক্ষ্যটিকে চিহ্নিত করতে অধিক আগ্রহী।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যক, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলতে লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতাকেই বুঝতে হবে। এইপ্রকার ন্যায়নিষ্ঠতা লিঙ্গ অনপেক্ষ নিয়ম–নীতির দ্বারা লাভ করা যাবে, নাকি লিঙ্গ সচেতন নিয়ম–নীতি প্রয়োজন হবে, তাই নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত। যদিও এই ব্যাপারে সবাই একমত যে, একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই সম অবস্থান থাকাটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লিঙ্গ পার্থক্যকে বিলুপ্ত করার প্রয়োজন, নাকি লিঙ্গ পার্থক্যকে বহাল রাখা উচিত, সেই প্রসঙ্গে কিস মনে করেন যে, যদি দেখা যায় লিঙ্গ একটি উচ্চ–নীচ স্তরবিশিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা নির্মাণ যা নারীকে পুরুষানুগত করে থাকে, তাহলে ন্যায়নিষ্ঠতার জন্য ভবিষ্যতে লিঙ্গ বর্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হতে পারে। যদিও কোনো কোনো নারীবাদী মনে করেন যে, ভবিষ্যতে লিঙ্গ বর্জিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে লিঙ্গ সচেতন নিয়ম-নীতি প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না।

ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিকতার অপরিহার্য্য সোপানগুলির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতা অন্যতম। নৈতিকতায় এই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শটিকে নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে, বিশেষ করে মূলস্রোত ও নারীবাদী দার্শনিকদের চাপান–উতরের কোনো শেষ নেই। এই প্রসঙ্গে এলিজাবেথ কিস (Elezabeth Kiss, 1961-) মনে করেন, নৈতিক প্রেক্ষাপটে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে অস্বীকার করাটা দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা থাকা উচিত বলেই তাঁর অভিমত। যেমন একটি গোষ্ঠীর নেতা বা দলপ্রধান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একজন পরীক্ষক যখন

পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করবেন বা যখন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমালোচনা করা হবে, তখন নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান গ্রহণ করাটাই বাঞ্ছনীয়। এমনকি কেউ যদি অন্য কারোর প্রতি নৃশংস ব্যবহার করে, তাহলে সেই কাজটিকে লিঙ্গ নির্বিশেষে অনৈতিক বলে চিহ্নিত করাই অভিপ্রেত। বরং যেক্ষেত্রে স্বজন পোষণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানানো উচিত বলেই কিস মনে করেন। তাঁর বক্তব্য হল নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে অস্বীকার করলে সুবিচার বা ন্যায়নিষ্ঠতার দাবিটিকেও অস্বীকার করতে হবে। কিস যেহেতু লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাই তিনি প্রাথমিক স্তরে ভিন্নতা বা সমরূপিতাকে নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদনযোগ্য উপাদান হিসাবে স্বীকার করে নিলেও, 'মেটা লেভেল', বা চূড়ান্ত পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকেই অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন। তিনি ভিন্নতার জন্য ভিন্নতাকে স্বীকার করার পক্ষপাতী নন, কারণ সেক্ষেত্রে সাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে, ফলে সুবিচার বা ন্যায়নিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হবে না। কিস মনে করেন, যদি ন্যায়নিষ্ঠতা বা ন্যায্যতা প্রতিপাদন নৈতিকতার লক্ষ্য হয়, তাহলে কোনো না কোনোভাবে নৈর্ব্যক্তিকতার দাবিটিকে অবশ্যই বহাল রাখতে হবে।

কিস নৈর্ব্যক্তিকতার সমর্থক হলেও তিনি ধ্রুপদী মতাদর্শীদের মতো অন্ধ সমর্থক নন। তাই বিনাবিচারে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে তিনি ন্যায্যতা প্রতিপাদনের যথাযথ মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করবেন না। তাঁর মতে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে বিচারপূর্বক সুচিন্তিতভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সুবিচার দেওয়া সম্ভব হয়। এইভাবে বিভিন্নতাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েও কীভাবে সুবিচার বা ন্যায়নিষ্ঠতা প্রদান করা যায় সেই লক্ষ্যে কিস রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্বণ্টনের নীতিটিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি এই নীতিটির সাহয্যে বিভিন্ন অবস্থান বা প্রেক্ষিতগুলিকে সহযোগিতার মাধ্যমে নারী তথা সকল প্রান্তিকগোষ্ঠীর শোষণের মাত্রাগুলিকে দূর করার আশা রাখেন, এবং দেখতে চান যে, ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিকতার আওতায় ভিন্নতাগুলির যথাযথ প্রতিফলন সম্ভব হচ্ছে কিনা। সেক্ষেত্রে কোনো সমালোচনা অপেক্ষা পুনর্নির্মাণের পন্থাই আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে বলেই কিস্–এর অভিমত।

উদারপন্থী নারীবাদীদের যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনো স্বতন্ত্র তত্ত্ব নীতিগত বা কৌশলগত দিক থেকে প্রদত্ত হওয়ার কথা নয়, বা তেমন কোনো দৃষ্টান্তের সন্ধান নারীবাদী দর্শনে পাওয়া যায় না। এটা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদারপন্থী নারীবাদে তাত্ত্বিক স্তরে কোনো

দোষ স্বীকৃত নয়। যাবতীয় দোষ তথ্যভূমি এবং প্রয়োগিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাই মূলস্রোত–এর কোনো তত্ত্বকেই তাঁরা অযথা সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। একথা যুক্তিবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। উদারপন্থী নারীবাদীরা অবশ্য একথা মানেন যে, যেকোনো তত্ত্বেরই কোনো না কোনো যৌক্তিক ভিত্তিভূমি থাকে, বা সেগুলি যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতির দ্বারা আবশ্যিকভাবেই প্রভাবিত হয়ে থাকে। যদিও এইসব যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়ম–নীতি দুষ্য হতে পারে, কিন্তু তা ত্যাজ্য নয়।

ধ্রুপদী দর্শনে আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞান বলতে মূলত অ্যারিস্টটল (Aristotle, 384BC-322BC)-এর আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের কথাই ধরা হয়। এই যুক্তিবিজ্ঞান আকারগত কিন্তু আকারসর্বস্ব নয়। মূর্ত বিষয়গুলিকে বিমূর্ত নিয়ম–নীতির মাধ্যমে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই এইজাতীয় আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানের মূখ্য উদ্দেশ্য। দ্বি-মান বিশিষ্ট দ্বি-কোটিক যৌক্তিক কাঠামো প্রদান, এবং পূর্বতসিদ্ধ চিন্তন বিধি প্রণয়ন হল এই যুক্তিবিজ্ঞানের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। এইস্থলে আবশ্যিক বিষয় হল দ্বি-মান ও দ্বি-কোটিক চিন্তা প্রকাশক মৌলিক নীতিগুলির পর্যালোচনা, যেগুলিকে সমগ্র দর্শনের জগতে অ্যারিস্টটলের এক অনবদ্য অবদান হিসাবে স্বীকার করা এবং মান্যতা দেওয়া হয়। অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ওইসব চিন্তার আকার বা বিধিগুলি অধুনা চিন্তার নিয়ম হিসাবে প্রসিদ্ধ। দর্শনের জগতে মূলত তিনটি চিন্তন নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল, তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধ–বাধক নিয়ম, নির্মাধ্যম নিয়ম।

উদারপন্থী নারীবাদীরা অ্যারিস্টটলের মতো করেই মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসাবে দেখতে চান। সেক্ষেত্রে যৌক্তিক হওয়ার লক্ষণ হল নিয়মনিষ্ঠ হওয়া। তাই মানুষের চিন্তার সীমানা এবং সীমাবদ্ধতা, চিন্তন নিয়মের অনুগামী হওয়া বাঞ্ছনীয়। চিন্তন থেকেই বিশ্বাস এবং জ্ঞান গঠিত হয়। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা যায় না, সেই বিষয়ের জ্ঞানলাভ কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না।

আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানের উক্ত চিন্তন নিয়মগুলি, চিন্তার যাবতীয় উপাদান বা বিষয়কে দুটি নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট কোটিতে ভাগ করে। এই কারণে আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানকে দ্বি-কোটিক যুক্তিবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এর একটি কোটি হল ‘p’,এটি ভাবকোটি এবং অপরটি হল ‘~p’, যেটা কিনা অভাবকোটি। ফলে যা কিছু সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে পারি তা হয় ভাবকোটি–এর সদস্য, অথবা অভাবকোটি–এর সদস্য হবে। এর অতিরিক্ত কোনো সম্ভাব্য অবস্থান স্বীকার

করা হয় না। একইসঙ্গে এইপ্রকার যুক্তিবিজ্ঞানকে দ্বি-মানবিশিষ্ট যুক্তিবিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে, কারণ 'p' এবং '~p', অর্থাৎ ভাবকোটি এবং অভাবকোটির মধ্যে একটি যদি সত্য হয়, তাহলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হয়। সত্য ও মিথ্যা ছাড়া অন্য কোনো মান এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং 'p' যদি সত্য হয়, তাহলে '~p' অবশ্যই মিথ্যা হবে। এখানে অনেকান্ততা, অস্পষ্টতা বা সম্ভাব্যতার কোনো জায়গা নেই।

উদারপন্থী নারীবাদীরা দ্বি-কোটিক বা দ্বি-মানবিশিষ্ট আকারগত যুক্তিবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-কাঠামো নিয়ে ভাবিত নন। এমনকি তাঁরা বিকল্প যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামো চান না। প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁরা লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান চান, এবং লিঙ্গ রাজনীতির ফলস্বরূপ লিঙ্গ পার্থক্য কীভাবে লিঙ্গ বৈষম্যে পর্যবসিত হয়ে যায় - সেই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরা মনে করেন ক্ষমতার রাজনীতির কারণেই এমনটা ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে পুরুষসুলভ গুণগুলি স্থান পায় ভাবকোটিতে, ফলে সেগুলি মূল্যবান হিসাবে বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে নারীসুলভ গুণগুলি স্থান পায় অভাবকোটিতে এবং সেগুলির অবমূল্যায়ন ঘটে থাকে। যেহেতু দ্বি-কোটিক এবং দ্বি-মান উভয়ই নির্দিষ্ট, তাই পুরুষের লিঙ্গ ধর্ম সর্বদাই 'p', ফলে মূল্যবিচারে সেগুলি উৎকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত। বিপরীতে নারীর লিঙ্গ ধর্ম সর্বদাই '~p', ফলে মূল্যবিচারে সেগুলি নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়। নারীবাদীদের প্রশ্ন যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-মাত্রিক কাঠামো নিয়ে নয়। তাদের প্রশ্ন দ্বি-বিভাজন নীতিটিকে নিয়ে। তাই উদারপন্থী নারীবাদীরা চিরাচরিত যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামোর কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে নারীর লিঙ্গ লাঞ্ছিত গুণগুলিকে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে উপযুক্ত স্থানে অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে চান। ফলত তাঁরা প্রতিষ্ঠিত আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানের পুনর্নির্মাণ করতে আগ্রহী।

চতুর্থ অধ্যায়ে চরমপন্থী নারীবাদের কিছু বিক্ষিপ্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থানকে একত্রিত করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তাঁদের চিন্তাধারার মধ্য থেকে দার্শনিক তন্ত্র গঠনের উপযোগী কোনোপ্রকার সূত্র–সম্বন্ধ উঠে আসে কিনা।

চরমপন্থী নারীবাদীরা তাঁদের আধিবিদ্যক অবস্থান থেকে নারী–পুরুষের দুটি পরিচয় স্বীকার করেন, একটি হল যৌন পরিচয় এবং অপরটি হল লিঙ্গ পরিচয়। সাধারণত মনে করা হয় যে, মানুষের যৌন পরিচয় জৈবিকভাবে নির্ধারিত, এবং লিঙ্গ পরিচয় সামাজিকভাবে আরোপিত। চরমপন্থী নারীবাদীরা এই মত সম্পূর্ণত সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন যে,

মানুষের যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয়–এর মধ্যে যে সম্পর্ক তা একমুখী নয়। উভয় পরিচয়ই একে–অপরকে প্রভাবিত করে, এবং তার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয় মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। চরমপন্থী নারীবাদীরা যৌন ও লিঙ্গ পরিচয় অতিরিক্ত কোনো অনপেক্ষ মানবধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁদের দাবি হল, কোনো মানুষের পক্ষে লিঙ্গ পরিচয়কে ত্যাগ করা, অথবা লিঙ্গ পরিচয়-এর উত্তরণ ঘটানো কোনোটাই সম্ভব নয়। তাই বলে এমনটাও মনে করার কোনো কারণ নেই যে, জন্মসূত্রেই প্রথিত হয়ে থাকে নারী–পুরুষের সৃজিত লিঙ্গ ধর্মের বীজ। চরমপন্থী নারীবাদীরা লিঙ্গ অনপেক্ষ অবস্থান স্বীকার করেন না ঠিকই, কিন্তু লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস রাখেন। সেক্ষেত্রে নারী–পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় এর মধ্যে যদি সাম্য ভাবনা নিহিত থাকে, তাহলে লিঙ্গ বৈষম্যের সমাধান সম্ভব হতে পারে বলেই এদের অভিমত।

চরমপন্থী নারীবাদীরা যেহেতু অনপেক্ষ কোনো মানবধর্ম স্বীকার করেন না, তাই তাঁরা মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসেবে না দেখে, তাকে অনুভূতিপ্রবণ জীব হিসাবে দেখতে চান। সেই কারণে তত্ত্বের প্রেক্ষিতে যুক্তির আধিপত্যকে তাঁরা খারিজ করে দেন, এবং লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কেবল চর্যা বা প্রতিষ্ঠান নয়, ধারণার স্তরেও পরিবর্তন আবশ্যক বলে মনে করেন। এদের মতে লিঙ্গ বৈষম্য সর্বত্রগামী, ফলে শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের চর্যা এবং সেই চর্যায় মদতকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হলেই সমস্যার সমাধান হবে এমন নয়। ওই প্রতিষ্ঠানের পিছনে যে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিধৃত হয়ে আছে তার পরিবর্তনও প্রয়োজন। সুতরাং কোনো তত্ত্বের লিঙ্গ বর্জিত রূপদান সম্ভব নয়। তাই চরমপন্থী নারীবাদীরা যখন লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান চান তখন তাঁরা অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প গ্রহণ করেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন, স্বার্থচিন্তা এবং ক্ষমতার কর্তৃত্ব লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণ। তাত্ত্বিক স্তরে কোনোপ্রকার অনবধান বশত এমনটা ঘটে থাকে তা নয়, বরং তা হল সচেতন ক্রিয়ার ফসল। এর মূলে আছে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং ঘৃণ্য লিঙ্গ রাজনীতি। এই ধরনের ত্রুটিকে তাঁরা 'সম্পাদিত দোষ' হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। এই দোষ দূর করার জন্য সাপেক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্বের আমূল সংস্কার করাটাই এদের নির্ধারিত লক্ষ্য।

চরমপন্থী নারীবাদী চিন্তাধারায় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় ভিন্নমতের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে যেমন বিষয়নিষ্ঠতা বা প্রেক্ষিত অনপেক্ষতার স্বপক্ষে নানা মত পাওয়া যায়, তেমনি আবার বিষয়ীনিষ্ঠতা বা আপেক্ষিকতার নিরিখেও জ্ঞানলাভের দাবি জানানো হয়। যদিও এইপ্রকার দাবিগুলিও অনেক সূক্ষ্ম বিচারের অপেক্ষা রাখে। কারণ যে সমস্ত নারীবাদী

জ্ঞানতাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয়ীনিষ্ঠতার স্বপক্ষে কথা বলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে আপেক্ষিকতাকে স্বীকৃতি দিলেও দেখা যায় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁরা আপেক্ষিকতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে চাইছেন। এই প্রসঙ্গে নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক স্যান্ড্রা হার্ডিং (Sandra Harding, 1935-)–এর মত অভিনবত্বের দাবি রাখে। তিনি বিষয়নিষ্ঠতা এবং আপেক্ষিকতার দ্বৈততার ধারণাটিকে স্বীকার করেন না। ফলে জ্ঞান হয় বিষয়ীনিষ্ঠ বা আপেক্ষিক হবে, না হয় বিষয়নিষ্ঠ বা অনপেক্ষ হবে এমন নয়। বরং তিনি এর মধ্যবর্তী কোনো এক অবস্থানকে নিজের মতের স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। হার্ডিং মনে করেন, মূলস্রোতীয় যে নিরপেক্ষতা বা সম্পূর্ণ প্রেক্ষিত অনপেক্ষতার ধারণা, সেটি প্রকৃতপক্ষে এক 'দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতা'র ধারণা। তিনি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার পরিবর্তে প্রসঙ্গ সংবেদনশীল বিষয়নিষ্ঠতার দাবি জানাচ্ছেন। এই সংবেদনশীলতা হল ক্ষমতা ও রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা যা সর্বত্রব্যাপী। এই ধরনের প্রসঙ্গ সংবেদনশীল বিষয়নিষ্ঠতাকে হার্ডিং 'সবল বিষয়নিষ্ঠতা' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সমাজে অসাম্য হল একটি চরম বাস্তবতা। সামাজিক উচ্চ–নীচ স্তরভেদে এই অসাম্যের বাতাবরণে একদল মানুষ সুবিধাপ্রাপ্ত, ক্ষমতাসীন এবং অপরদল ক্ষমতাহীন। ফলে তারা বঞ্চিত।

হার্ডিং মনে করেন, যারা ক্ষমতাহীন বা বঞ্চিত সেইসব প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষজনই আমাদের চিন্তা–ভাবনা বা গবেষণা বা অনুসন্ধান কার্যের প্রারম্ভিক বিন্দু হিসাবে গৃহীত হওয়া উচিত। তার কারণ এই নয় যে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্বোধের অবস্থান হিসাবে তুলে ধরা হবে। বরং তারা কেন্দ্র ও প্রান্ত উভয় অবস্থানের ক্ষমতা ও রাজনীতির বন্টন, বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

দর্শনের জগতে অধুনা যে সমস্ত নীতিতত্ত্বগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এবং যেগুলি মূলস্রোতীয় না হওয়া সত্ত্বেও জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল 'দরদী নীতিতত্ত্ব'। নারীবাদী চিন্তার জগতে একাধিক দরদী নীতিতত্ত্ব আছে যেখানে দরদকে একটি নৈতিক সদগুণ হিসাবে মান্যতা দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রেক্ষিতে গিলিগান (Carol Gilligan, 1936-) প্রদত্ত 'দরদী নীতিতত্ত্ব'কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কারণ এই তত্ত্বটিতে 'দরদ'–রূপ উক্ত নৈতিক সদগুণের যথাযথ স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায় বলেই আপাতভাবে মনে হয়। গিলিগান–এর দরদী নীতিতত্ত্বে, 'দরদ' হল একধরনের নৈতিক আবেগ বা অনুভূতি। এইজাতীয় নৈতিকতার মূল উপজীব্য বিষয় হল একে–অপরের প্রতি দরদী

হওয়া। এক্ষেত্রে দরদী হওয়ার অর্থ কাউকেই যত্ন বা পরিচর্যা করা নয়, বা উদ্দেশ্যহীন নিষ্ফল প্রশ্রয় দান করাও নয়। নৈতিকতার প্রেক্ষিতে 'দরদ' বলতে বোঝায় অপরের সঙ্গে বা কোনো একটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রকৃত সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে, কোনো আচরণকে আবেগ–অনুভূতি সহকারে বিচার–বিশ্লেষণ করে, উক্ত বিচার্য বিষয় সম্পর্কে মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এই বিচার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম–নীতি নির্ভর পদ্ধতি নয়। এ হল একান্তই নৈতিক কর্তার অনুভূতিজাত একটি প্রক্রিয়া। দরদী নৈতিকতায় দরদভিত্তিক ক্রিয়া বা আচরণগুলি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি নির্ভর না হলেও সেগুলিকে সার্বজনীন হিসাবে দাবি করা হয়। সার্বজনীন এই অর্থেই, যেহেতু দরদ–এর চাহিদা প্রত্যেকেরই থাকে। এক্ষেত্রে বক্তব্য হল প্রত্যেকে যদি নিজেদের ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের উদ্দেশ্য হিসাবে দরদকে গ্রহণ করে, তাহলে নৈতিক জগতে দরদ–এর একটি সার্বিক রূপের প্রকাশ ঘটবে। পাশাপাশি এইস্থলে একপ্রকার স্ব–অভিমুখী চিন্তা–ভাবনাও থাকবে, কারণ প্রত্যেকে দরদের মাধ্যমে একে–অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে এমন এক জগৎ গঠনের প্রতি মনোযোগী হবে যা সবার যাপনের পক্ষে অনুকূল। সেখানে প্রত্যেকেই অপরের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বার্থটিকেও প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। মানুষ অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং তাদের যাপনের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি সবকিছুই ভিন্নতর। সুতরাং অন্যকে বোঝাটা যেমন আবশ্যক তেমনি নিজেকে বোঝাটাও আবশ্যক।

দরদী নৈতিকতা পরামর্শমূলক এবং পরিস্থিতি নির্ভর। তাই পূর্বতসিদ্ধ কোনো কাঠামো বা প্রকার এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। সেই কারণেই এই নৈতিকতার লক্ষ্য যে ধরনের নৈতিক জগৎ, তা পূর্ব অস্তিত্বশীল কোনো জগৎ নয়। সামাজিক নানা ঘাত–প্রতিঘাতে নির্মিত হবে নৈতিক সত্তা তথা নৈতিক জগৎ। দরদী নৈতিকতায় দরদের সার্বিক চাহিদার কথা স্বীকার করা হলেও, সকলের প্রতি 'দরদ' প্রদর্শন করা বা সার্বিক ভালোবাসার দাবি জানানো হয় না। সম্পর্কের পরিসরে আমরা যাদের সঙ্গে যুক্ত হই, বা যারা আমাদের যাপনের প্রেক্ষাপটে অঙ্গীভূত, তাদের প্রতি 'দরদ' প্রদর্শনের কথাই বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া গিলিগান মনে করেন, যেকোনো ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে আবশ্যিকভাবে 'দরদ' নাও থাকতে পারে। উপরন্ত এক্ষেত্রে আমরা এমন এক নৈতিক জগৎ তৈরিতে অঙ্গীকারবদ্ধ, যেখানে আমরা একে–অপরের প্রতি যথাসম্ভব দরদী হব। মনে রাখা প্রয়োজন, দরদী নৈতিকতায় 'দরদ' শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

নারীবাদী দর্শনের আলোচনায় দেখা যায় যে, সমাজে দ্বৈততার ধারণা নারী–পুরুষের অবস্থান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। আমরা জানি যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে যে লিঙ্গ পার্থক্য আছে তা স্বাভাবিক, কারণ বাস্তবতাগুলোকে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না, এবং সেই বাস্তবতাগুলো অনেকাংশেই সমাজে নারী–পুরুষের গুণ–ধর্ম নির্ধারণের প্রতি কারণ। কিন্তু যখন লিঙ্গ অনুযায়ী নির্ধারিত সেই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিছু বিশেষ গুণাগুণকে উচ্চকোটিতে স্থান দেওয়া হয়, এবং একইসঙ্গে কতকগুলি বিশেষ গুণ স্থান পায় নিম্নকোটিতে, তখন হয় সমস্যার সূত্রপাত। এখান থেকেই গড়ে ওঠে বৈষম্যের ধারণা। উক্ত বৈষম্যটিকে মননে রেখে আমরা যদি ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানের গঠন বা কাঠামোর দিকে লক্ষ দিই, তাহলে সেখানেও দেখা যাবে যে, যাবতীয় গুণগুলির মধ্যে কিছু স্থান পায় সদর্থক কোটিতে, আর বাকি গুণগুলি স্থান পায় ওই সদর্থক কোটির বিপরীত নঞর্থক কোটিতে। যেমন পুরুষ যদি হয় 'p' তাহলে নারী হবে '~p'। এক্ষেত্রে নারীকে দেখা হয় পুরুষের গুণাবলীর অভাবযুক্ত হিসাবে। এটাই হল মৌলিক যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-মাত্রিক কাঠামো। অর্থাৎ ওই দুটি মাত্রার মধ্যে কোনোকিছু হয় 'p' হবে অথবা '~p' হবে। এর অতিরিক্ত কোনো মাত্রা বা প্রকার এখানে স্বীকৃত নয়। নারীবাদীদের আপত্তি এইখানেই।

নারীবাদী দার্শনিক ভ্যাল প্লামউড (Val Plumwood, 1939-2008) দাবি করেন যে, ধ্রুপদী মৌলিক যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-মাত্রিকতা কেবল যে সমাজে নারী–পুরুষের অবস্থান নির্ধারণ করে তাই নয়, এই নীতির দ্বারা সমাজের অপরাপর প্রান্তিক গোষ্ঠীও অবদমিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা পায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পড়ে পাওয়া স্বাধীনতা, এবং ক্ষমতাহীন গোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সার্বত্রিক অধীনতা। প্লামউড মনে করেন, সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসের একপ্রকার ক্রমোচ্চ স্তরায়ন আছে, যা এইপ্রকার যৌক্তিক কাঠামোর দ্বারা মূর্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ক্ষমতা বিন্যাসের মধ্যে কোনো সমরূপিতা নেই, তা সর্বদাই আপেক্ষিক। তাই প্লামউড সামাজিক স্তরবিন্যাসকে কেবল নারী–পুরুষের ভাগাভাগির মধ্যে ফেলে রাখতে চান না। তিনি চান লৈঙ্গিক মাত্রা ছাড়াও সামাজিক অবদমনের অন্যান্য মাত্রাগুলিও যুক্ত হোক। অর্থাৎ একজন নারীর, নারী হওয়াটাই শোষণের বা বঞ্চনার একমাত্র সূচক নয়, একজন নারী কীভাবে কতটা শোষিত হবে তা নির্ভর করবে সেই নারী কোন্ বর্ণের, কোন্ ধর্মের বা কীরূপ অর্থনৈতিক অবস্থানে সে আছে তার উপর। একইভাবে একজন পুরুষ কতটা ক্ষমতাধর তা নির্ধারিত হয় সেই পুরুষের ধর্ম-বর্ণ-অর্থ ইত্যাদি সূচকের নিরিখে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক, ব্যক্তিক–সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত ভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যা ও তার ভিত্তিতে কোন্ ধরনের দার্শনিক তন্ত্র অনুস্যূত হতে পারে, সেই সম্পর্কে বিচারমূলক বিশ্লেষণ করাটাই মূল লক্ষ্য।

দার্শনিক অনুসন্ধানের অন্যতম মুখ্য প্রশ্নটি হল জগত ও জীবের স্বরূপ কী ? সেই কারণে নানা শাখা–প্রশাখা সমন্বিত দর্শনশাস্ত্র তথা দার্শনিক তন্ত্র–এর প্রকৃতি সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনার পূর্বে সত্তার স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। মূলস্রোতের ধ্রুপদী আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত যে আধিবিদ্যক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই বিষয়ক কোনো আলোচনা এই প্রসঙ্গে অপেক্ষিত নয়। এইস্থলে আলোচ্য বিষয় হলো ব্যক্তিক–সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত নারীবাদী আখ্যান। যেখানে সত্তার স্বরূপ নিছক কোনো তাত্ত্বিক চিন্তার দ্বারা নির্ধারিত নয়। তা নির্মিত হয় সামাজিক–সাংস্কৃতিক নানা ঘাত–প্রতিঘাতে। তাই আলোচ্যস্থলে ব্যক্তিক–সত্তা বলতে নানান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমন্বিত সত্তাকেই বুঝতে হবে। এইরূপ সত্তার সঙ্গে বিভিন্ন শাখা–প্রশাখা সমন্বিত দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি কীভাবে পরস্পর অনুস্যূত হয়ে থাকতে পারে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করাই এই আলোচনার একমাত্র অভিপ্রায়। উক্ত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি কীরূপ হতে পারে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। কারণ মূলস্রোতের দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি সর্বজনবিদিত হলেও, নারীবাদী কোনো দার্শনিক তন্ত্র এযাবৎ অস্তিত্বশীল নয়। দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ধ্রুপদী ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যপূর্ণ তত্ত্বগুলির সমন্বয়ে নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি কীরূপ হতে পারে সেই সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

নারীবাদী তন্ত্র-কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে কি নেই, সেটি এক ভিন্নতর প্রশ্ন। মনে রাখা প্রয়োজন, নারীসুলভ গুণগুলি যেহেতু মূলস্রোতের দার্শনিক তত্ত্ব বা তন্ত্র-কাঠামোতে কোনোভাবেই গুরুত্ব পায় না, উপরন্তু পুরুষসুলভ গুণগুলি দৃষ্টান্তরূপে প্রতিস্থাপিত হয়, যেগুলি কিনা মেরুকরণ ও বিভেদ রচনার অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট যদি পুরুষসুলভ গুণের ভিত্তিতে রচিত হয়, তাহলে এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তা নারী তথা অপরাপর প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধাস্বরূপ এক

প্রাচীর নির্মাণ করবে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নারীর পক্ষে ব্যবহারোপযোগী দার্শনিক তন্ত্র-কাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। এই বিষয়ে অবশ্য নারীবাদীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে, তথাপি এই গবেষণায় আমরা নারীবাদ-এর আভ্যন্তরীণ বাদানুবাদগুলি সরিয়ে রেখে নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় আগ্রহী। কারণ উক্ত প্রশ্নটির সঙ্গে দর্শন অপেক্ষা অধিক মাত্রায় জড়িয়ে আছে একটি রাজনৈতিক সমীকরণ। কারণ নারীবাদীরা মনে করেন, তন্ত্র মাত্রই ক্ষমতার মেরুকরণকে প্রশ্রয় দেয়। ক্ষমতার প্রসঙ্গ এলে সেখানে আবশ্যিকভাবে রাজনীতির অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে যায়। নারীবাদীরা যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতার রাজনীতিটিকে চিহ্নিত করতে চান, তাই তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান ঘোষণা করে থাকেন। এইস্থলে আলোচ্য বিষয় হল বিভিন্ন নারীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা সেই বিষয়ক অনুসন্ধান। কোনো তন্ত্রের বিন্যাস বা প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চিন্তার সঙ্গতি রক্ষা করা। কারণ সঙ্গতিপূর্ণ তন্ত্র-কাঠামো অনায়াসেই দার্শনিকতার অভিমুখে প্রসারিত হওয়ার যোগ্য। যেকোনো দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার পূর্ণাঙ্গ সুসংহত রূপ দার্শনিক তন্ত্রের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এইস্থলে নারীবাদীদের বিচিত্র চিন্তাধারাকে একত্রিত করে যদি সঙ্গতিপূর্ণ দার্শনিক তন্ত্র রচনা করা যায়, তাহলে নারীবাদও পূর্ণাঙ্গ দর্শনশাস্ত্রের রূপ ধারণ করতে পারবে।

নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে পূর্বালোচিত বিশেষ বিশেষ অধ্যায়গুলিতে বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেক্ষেত্রে একক কোনো নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় না, যদিও ভিন্ন ঘরানায় বিভিন্ন নারীবাদী প্রবর্তিত তত্ত্বগুলিকে সমন্বিত করে এক ধরনের সমষ্টিগত (collective) বা জোটবদ্ধ (Coalition) দার্শনিক তন্ত্র গড়ে তোলাটা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য হলেও অসম্ভব বলে মনে হয় না। সুতরাং নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র হলো সংহতিপূর্ণ (integrity) সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে কোনো ক্রমোচ্চ স্তরায়ন বা থাকবন্দি বিন্যাস থাকবে না। এইজাতীয় তন্ত্র প্রতিযোগিতামূলক (competitive) নয়, পারস্পরিক সহযোগিতার (co-operation) ভিত্তিতে রচিত। আমরা জানি যেকোনো দার্শনিক আলোচনার মূল লক্ষ্য তথা

পদ্ধতি হলো পরমত খন্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠা। স্বমত প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় যদি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের সমষ্টিগত রূপটি তার সহযোগিতামূলক ভাবটিকে প্রকাশ করে থাকে। নারীবাদী চিন্তাধারার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব অপেক্ষা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি সাধন করা। ফলত যে বাস্তব তথ্যভিত্তির উপর নির্ভর করে কোনো তত্ত্ব রচিত হয়, সেই তথ্যভিত্তির পরিবর্তনে তত্ত্বের পরিবর্তন এবং তত্ত্বের পরিবর্তনে তন্ত্র-কাঠামোর পরিবর্তনও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র স্থির (static) নয়, সর্বদাই গতিশীল (dynamic), এই তন্ত্র চিরস্থায়ী নয় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী - বহমানতা এর অপরিহার্য ধর্ম। এইজাতীয় তন্ত্রে কোনো আবেষ্টন (closure) থাকবে না, আদান-প্রদানের জন্য সর্বদাই খোলা মুখ রক্ষিত হবে।

আমরা জানি, লিঙ্গমাত্রাকে বিসর্জন দিয়ে কোনো নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। তাই নারীবাদী যেকোনো দার্শনিক তন্ত্র লিঙ্গ বর্জিত নয়, বরং লিঙ্গ বৈষম্য বর্জিত। লিঙ্গ প্রেক্ষিত গৃহীত হয়ে থাকে বলে নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রে সাপেক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু সাপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক এমন কোনো উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। এই কারণে বিমূর্ত সার্বিকীকরণ অপেক্ষা, মূর্ত সাধারণীকরণ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকে।

এখন ব্যক্তিক সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত নারীবাদী মত জেনে নেওয়া আবশ্যক। দর্শনের জগতে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গঠনগত স্বরূপের ভিত্তিতে মূলত দুই ধরনের সত্তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হল 'আণবিক সত্তা' এবং অপরটি হল 'সম্পর্কিত সত্তা'। আণবিক সত্তা হলো সেই সত্তা যা তার যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের বেড়াজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব–স্বরূপে অবস্থান করে, এবং 'স্ব' ও 'অপর'–এর মধ্যে গড়ে তোলে স্পষ্ট সীমারেখা। দাবি করা হয় যে, এইপ্রকার সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ যুক্তির অধিকারী এবং তার দ্বারা গৃহীত সকল প্রকার সিদ্ধান্ত হয় যুক্তিনির্ভর। যুক্তিপ্রয়োগে পারদর্শী হওয়াটাই আণবিক সত্তার বিশেষ ধর্ম। কোনোপ্রকার বিষয়ীনিষ্ঠ আবেগ, বা অনুভূতির বন্ধনে সে আবদ্ধ নয়। সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থান থেকেই সে লাভ করে স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা। প্রেক্ষিত সাপেক্ষতাকে

বর্জন করে, বিষমরূপিতা বা বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করে, বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার দ্বারা সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সমরূপিতাকে প্রতিষ্ঠা করাই এইরূপ সত্তার একমাত্র লক্ষ্য।

আণবিক সত্তা বিশিষ্ট যে 'আমি', সেই 'আমি' হল 'স্বগত সত্তা'। এই সত্তাবিশিষ্ট আমি'র সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এবং যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তার নিজের অবস্থানটিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। এইরূপ অবস্থান থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি একান্তই তার নিজস্ব যুক্তি নির্ভর। এর জন্য সে অপর কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সাপেক্ষ প্রেক্ষিত নির্ভর নয়। আণবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে যেভাবে নিজেদের ব্যক্তিক সত্তাগুলিকে গড়ে তোলে, তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলত এইপ্রকার বিভিন্ন সাপেক্ষ অবস্থানগুলির মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে, সেই লক্ষ্যে আণবিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা অনুগত সামান্য ধর্ম অন্বেষণ এর প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা কিনা সকল বিচ্ছিন্ন সত্তার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। বিশুদ্ধ যুক্তিই হল সেই অনুগত সামান্য ধর্ম যা আণবিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ অবস্থান ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। উক্ত অনুগত সামান্য ধর্মের ভিত্তিতেই গৃহীত হয় সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক দার্শনিক তত্ত্ব তথা তন্ত্র-কাঠামো, যার ফলে দার্শনিকতার প্রেক্ষাপটে ভিন্নতাগুলির প্রতিফলন ঘটে না বা ঘটা সম্ভব হয় না।

অপরপক্ষে দর্শনের জগতে সম্পর্কিত সত্তা বলতে বোঝায় সেই সত্তা, যা সর্বদাই কোনো না কোনো সম্পর্কে অবস্থান করে; সম্পর্ক বিচ্ছিন্নভাবে কোনো অবস্থান তার থাকে না। 'স্ব'–'অপর' ভেদবিশিষ্ট বিচ্ছিন্নতার বোধ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এইপ্রকার সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা সর্বদাই একে–অপরের মধ্যে সম্পর্কটিকে লালন–পালনের মধ্য দিয়ে নিজেরা বেঁচে থাকে, অন্যদেরকেও বাঁচিয়ে রাখে। কারণ এই অবস্থান থেকে মনে করা হয় যে, সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত থাকে জীবনের সার্থকতা এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের সম্ভাবনা। সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি এক সম্পর্ক ত্যাগ করলেও অপরাপর কোনো না কোনো সম্পর্কে সে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সম্পর্কটি কখনোই একমুখী নয়, তা সর্বদাই উভয়মুখী এক সম্পর্ক। যেখানে উভয়ই মনে করে যে, এইভাবে সম্পর্কিত থাকার মধ্য দিয়েই তারা খুঁজে পাবে তাদের বেঁচে থাকার রসদ। তাই তারা যেন–তেন–প্রকারেন এই সম্পর্কটিকে রক্ষা করতে সদা তৎপর। এইরূপ

সম্পর্ক সৃজিত কোনো সম্পর্ক নয়, কারণ সৃজিত সম্পর্কগুলি প্রয়োজনের স্বার্থে চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সম্পর্কিত সত্তার অনুষঙ্গে সম্পর্কটি হল এমন এক নিবিড় বন্ধন যেখানে বিচ্ছেদ মাত্রই তা বিনাশের নামান্তর; সম্পর্কের বিনাশ মানেই হল সত্তার বিনাশ।

এইপ্রকার সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থ–বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা–বাসনা সবই থাকে, কিন্তু তার সবটাই আবর্তিত হয় সম্পর্কটিকে ভিত্তি করে। ফলে দ্বান্দ্বিকতার পরিস্থিতি কখনোই সৃষ্টি হয় না, যদিও সম্পর্কের মধ্যে দোলাচল অবশ্যই থাকতে পারে। এখানে কোনো ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকেও বজায় রাখে স্বার্থ, লাভ করে স্বাতন্ত্র্য, ভোগ করে স্বাধীনতা। এটি এমন একপ্রকার আত্মিক সম্পর্ক যেখানে সহানুভূতি, সহমর্মিতার কোনো স্থান নেই। কারণ নারীবাদীরা মনে করেন সহানুভূতি বা সহমর্মিতার মধ্যেও 'স্ব'-'অপর' ভেদ বর্তমান থাকে। সেক্ষেত্রে পারস্পরিক 'সমভাব' হল এই সম্পর্কের সঞ্জীবনী, এখানে সবাই পরস্পরের অপর, কিন্তু কেউ কারোর পর নয়। এই সত্তা বিশুদ্ধ যুক্তির অধিকারী নয়। আবেগ, অনুভূতি, সংবেদনশীলতাই হল এর বিশেষ গুণ। সমরূপিতার পরিবর্তে বিষমরূপিতা, একরূপতার পরিবর্তে বিভিন্নতা, অনপেক্ষতার পরিবর্তে প্রেক্ষিত সাপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি সাপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা, এবং বিমূর্ততার পরিবর্তে মূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই উক্তপ্রকার সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাঙ্খিত লক্ষ্য।

পূর্বালোচিত অধ্যায়গুলির ভিত্তিতে এখন দেখে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিটি দার্শনিক তন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। একথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে মূলস্রোতে সুগঠিত দার্শনিক তন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও, ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে তা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে সেই বিষয়ক কোনো আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যদিকে নারীবাদে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত সুচিন্তিত মতাদর্শ থাকলেও, নেই কোনো সুগঠিত দার্শনিক তন্ত্রের অস্তিত্ব। বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে এপর্যন্ত যে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে লক্ষ করা গিয়েছে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক তন্ত্র রচিত হতে পারে, এবং সুসংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তা কীভাবে দার্শনিক তন্ত্রগুলিকে সমৃদ্ধ করে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির দিকে লক্ষ রেখে এইস্থলে দেখে নেওয়া প্রয়োজন বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে আলোচিত দার্শনিক তন্ত্রগুলির আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য কীরূপ হতে পারে। কারণ তার ভিত্তিতে বুঝে

নেওয়া সম্ভব হবে যে, ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক তন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় কি না, কিংবা এদের মধ্যে যোগসূত্র আদৌ কীভাবে স্থাপিত হতে পারে।

প্রাগুক্ত অধ্যায়গুলির আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান সমন্বিত বিভিন্ন দার্শনিক তন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে সম্পর্কযুক্ত বা অনুষঙ্গবদ্ধ হতে পারে তা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও দার্শনিক তন্ত্র যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত একথা অস্বীকার করার মতো কোনো সঙ্গত কারণ পরিলক্ষিত হয় না। সেক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছে যে কান্ট, হিউম, এবং উদারপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিষয়নিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, সার্বিকীকরণ, সমরূপিতা, এবং বিমূর্ত যুক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য্য। এইরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দার্শনিক তন্ত্রের অনুষঙ্গে আণবিক সত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি একান্ত কাম্য। কারণ সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় আণবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ ধর্ম হল প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র অবস্থান, যা তাকে বিশুদ্ধ যুক্তির অধিকারী করে তোলে, এবং তার দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয় বিষয়নিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ, সার্বিক, সমরূপী, বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় চরমপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের প্রেক্ষিতে, যেখানে বিশুদ্ধ বিমূর্ত যুক্তির পরিবর্তে স্থান পেয়েছে আবেগ-অনুভূতি, বিষয়নিষ্ঠতার পরিবর্তে বিষয়ীনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতার পরিবর্তে প্রেক্ষিত সাপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি সাপেক্ষতা, সার্বিকীকরণের পরিবর্তে বিশেষতা এবং সমরূপিতার পরিবর্তে বিষমরূপিতা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দার্শনিক তন্ত্রের পরিসরে সম্পর্কিত সত্তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কারণ সম্পর্কিত সত্তা হল সেই সত্তা, যার কোনো বিচ্ছিন্ন অবস্থান নেই; আবেগ-অনুভূতি-সংবেদনশীলতাই এর বিশেষ ধর্ম। সেই কারণে এইপ্রকার সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি তার গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে প্রেক্ষিত সাপেক্ষ অবস্থান থেকে মূর্ত ও মানবিক করে তুলতে প্রয়াসী হয়।

এপর্যন্ত ব্যক্তিক–সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তন্ত্রগুলি কীভাবে সম্পর্কিত বা অনুস্যূত হতে পারে সেই বিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশিষ্ট নারীবাদী চিন্তাধারা অনুসারে সত্তার গঠনগত স্বরূপের ভিত্তিতে দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি কী হওয়া উচিত, এবং মূলস্রোতের প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তন্ত্রের ভিত্তিতে সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কে কী অনুমান

করা যায়, সেই সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এইস্থলে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও দার্শনিক তন্ত্র যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত একথা অস্বীকার করার কোনো সঙ্গত কারণ না থাকলেও, তা অনিবার্য কোনো সম্পর্ক কিনা সেই বিষয়ক প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। যেহেতু সত্তার স্বরূপ এবং দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি পরস্পর অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হওয়ার কোনো জোরালো ভিত্তি দর্শনশাস্ত্রে বিরল, সেহেতু সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে দার্শনিক তন্ত্রের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক সিদ্ধ না হলেও, অন্ততপক্ষে সতত সংযোগের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ে এক ধরনের কার্য–কারণ সম্পর্কের আভাস অবশ্যই পাওয়া যায়। সুতরাং সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে তার ওপর নির্ভর করবে তদুপযুক্ত দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি।

ব্যক্তিক-সত্তার প্রেক্ষিতে যদি দার্শনিক তন্ত্রের সম্ভাব্য এবং বাস্তব রূপ নিয়ে আলোচনা করতে হয়, তাহলে সেই আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল প্রথমেই সত্তার বিভিন্ন স্বরূপ নির্ণয় করা বা সেটিকে বুঝবার প্রচেষ্টা করা। যদি আমরা দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব-কাঠামো এবং তন্ত্র-কাঠামো বিশ্লেষণ করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে, সেক্ষেত্রে সত্তার প্রেক্ষিতে গঠিত হওয়া দার্শনিক তন্ত্র কীরূপ হবে বা হতে পারে এই বিষয়টি দার্শনিকতার পরিসরে সাধারণত একেবারেই গুরুত্ব পায় না, যদিও বা পায় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে তা থেকে উত্তরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ দর্শনচর্চার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, ও ধারা এগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, একপ্রকার সূত্র-সম্বন্ধ সেক্ষেত্রে স্থাপন করা যেতেই পারে। আমরা যদি ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শন অতিরিক্ত অধুনা গড়ে ওঠা নারীবাদী চিন্তাধারার দিকে আলোকপাত করি সেখানে অবশ্য উক্ত ইঙ্গিতটি আরোও স্পষ্ট। সেই ইঙ্গিতটি আশা জাগায় এবং একইসঙ্গে সাহসও যোগায় এটা খুঁজে দেখার যে, সেইরকম সূত্র-সম্বন্ধ দর্শনচর্চার ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে নেই তো ? নারীবাদীদের কোনো সুপরিকল্পিত তত্ত্ব-কাঠামো বা কোনো সুসংহত তন্ত্র-কাঠামো, অথবা কোনো নির্দিষ্ট ধ্রুপদী ঘরানায় অবস্থান করার অস্মিতা হয়তো নেই। তবুও ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট কীভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে - নারীবাদীদের খুঁজে বের করা সেই সূত্রটি বর্তমান অনুসন্ধান কার্যের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

গ্রন্থপঞ্জি

- Beauvoir, Simon de, *The Ethics of Ambiguity*, trans. by Bernard Frechtman, Citadel Press, New York, 1976.
- Beauvoir, Simon de, *The Second Sex*, Trans. and ed. by H. M. Parshley, Picador, London, 1988.
- Beck, Lewis White, *A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason*, Chicago University Press, Chicago, 1966.
- Bhasin, Kamala, *Understanding Gender*, Women Unlimited, New Delhi, 2000.
- Bhasin, Kamala, *What is Patriarchy*, Women Unlimited, New Delhi, 1993.
- Chatterjee Sinha, Atashee, *The Many Faces of Reason and Violence*, Papyrus, Kolkata, 2005.
- Chanter, Tina, *Gender: Key Concepts in Philosophy*, Bloomsbury (First Published in India), 2016.
- Collins, Patricia Hill, "It's All In the Family: Intersections of Gender, Race, and Nation", in *Hypatia*, Vol. 13, No. 3, pp. 62-82, 1998.
- Copi, Irving M., and Cohen, Carl, *Introduction to Logic*, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2004.
- Crenshaw, K., "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", *The University of Chicago Legal Forum, Vol. 140*, pp. 139–167, 1989.
- Elliott, Anthony, *Concept of the Self*, Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2001.
- Fairfield, Paul, *Moral Selfhood in the Liberal Tradition: The Politics of Individuality*, University of Toronto Press, Canada, 2000.
- Ferguson, Ann, "A Feminist Aspect Theory of the Self", in *Canadian Journal of Philosophy*, eds. by Ann Garry and Marilyn Pearsall, Vol. 17, No. 1:13, pp. 339-356, 1987.
- Ferguson, Ann, "Twenty Years of Feminist Philosophy", in *Hypatia*, Vol. 9, No. 3, pp. 197-215, 1994.
- Feyerabend, Paul, *Farewell to Reason*, Verso, London, 1987.
- Foust, Mathew A., "Sex and Selfhood: What Feminist Philosophy can learn from Recent Ethnography in Ho Chi Minh City", in *Journal of International Women's Studies*, Vol. 14, No. 3, pp. 31-41, 2013.
- Freud, Sigmund, *Three Essay on The Theory of Sexuality*, trans. by A. A. Brill, 1920, globalgreyebooks.com, 2020.
- Fricker, Miranda, and Hornsby, Jennifer, eds. *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- Friedman, Marilyn, "Impartiality" in *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. by Alison M. Jagger and Iris Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Massachusetts, London, pp. 393-401, 1998.
- Gatens, Moira, *Imaginary Bodies*, Routledge, New York, 1996.
- Garry, Ann, "Intersectionality, Metaphors, and the Multiplicity of Gender", in *Hypatia*, Vol. 26, No. 4, pp. 826-850, 2011.

- Geetha, V., *Gender*, Stree, Kolkata, 2002.
- Gilligan, Carol, "Hearing the Difference: Theorizing Connection", in *Hypatia*, Vol. 10, No. 2, pp. 120-127, 1995.
- Gilligan, Carol, *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.
- Gilligan, Carol and et. al., eds. *Mapping the Moral Domain*, Harvard University Press, Cambridge, 1988.
- Grosz, Elizabeth, *Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism*, Indiana University Press, Bloomington, 1994.
- Haraway, Donna, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Partial Perspective", in *Feminism and Science*, eds. by Evelyn Fox Keller and Helen E. Longino, Oxford University Press, Oxford, 1996.
- Harding, Sandra, "Strong Objectivity: A Response to the New Objectivity Question", in *Synthese*, Vol. 104, No. 3, pp. 331-349, 1995.
- Harding, Sandra, *The Science Questions in Feminism*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1986.
- Harding, Sandra, "Rethinking Standpoint Epistemology: What is "Strong Objectivity" ?", in *Feminist Epistemologies*, eds. by L. Alcoff and E. Potter, Routledge, London, pp. 49-82, 1993.
- Haslanger, Sally, "On Being Objective and Being Objectified" in *A Mind of One's Own: Feminist Essays on Reason and Objectivity*, eds. by Louise M. Antony and Charlotte E. Witt, Routledge, New York, pp. 209-253, 2018.
- Heinamaa, Sara, "Women-Nature, Product, Style? Rethinking the Foundations of Feminist Philosophy of Science", in *Feminism, Science and the Philosophy of Science*, eds. by Lynn Hankinson Nelson and Jack Nelson, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 289-308, 1997.
- Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, ed. by L. A. Selby-Bigge, Clarendon Press, Oxford, 1888.
- Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, eds. by T. H. Green and T. H. Grose, Longmans Green and Co., London, 1878.
- Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, ed. by Tom L. Beauchamp, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Intro. by J. N. Mohanty, Progressive Publishers, Calcutta, 1999.
- Hume, David, *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, ed. by J. B. Schneewind, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1983.
- Jacobs, Jonathan A., *Ethics A-Z*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005.
- Jaggar, Alison M., and Young, Iris Marion, eds. *A Campanion to Feminist Philosophy*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000.
- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, trans. by Norman Kemp Smith, Macmillan, London, 1953.
- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, trans. and eds. by Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge University press, Cambridge, 1998.
- Kant, Immanuel, *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, trans. by H. J. Paton, as *The Moral Law*, Hutchinson and co. Ltd., London, 1976.

- Kant, Immanuel, *Logic*, trans. by Robert S. Hartman and Wolfgang Schwarz, Dover Publications, New York, 2017.
- Kiss, Elizabeth, "Justice", in *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. by Alison M. Jaggar and Iris Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, pp. 487-499, 2000.
- Koehn, Daryl, *Rethinking Feminist Ethics: Care, Trust and Empathy*, Routledge, London, 1998.
- Kornar, Stephen, *Kant*, Penguin, London, 1953.
- Langton, Rae H., "Beyond a Pragmatic Critique of Pure Reason", *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 71, No. 4, pp. 364-384, 1993.
- Langton, Rae H., *Sexual Solipsism:Philosophical Essays on Pornography and Objectification*, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- Lloyd, Elizabeth A., "Objectivity and Double Standard for Feminist Epistemologies", in *Synthese* , Vol. 104, No. 3, pp. 351-381, 1995.
- Lloyd, Genevieve, *The Man of Reason:"Male" and "Female" in Western Philosoph* , Routledge, London, 1993.
- Lloyd, Genevieve, "The Man of Reason", *Metaphilosophy*, Vol. 10, No. 1, pp.18-37,1979.
- Longino, Helen E., *Science as Social knowledge: Values and Objectivity In Scientific Enquiry*, Princeton University Press, Princeton, 1990.
- Lozano, Betty Ruth, and Grijalva, Daniela Paredes, "Feminism Cannot be Single Because Women are Diverse: Contributions to a Decolonial Black Feminism Stemming from the Experience of Black Women of the Colombian Pacific", in *Hypatia*, Vol. 37, No. 3, pp. 523-543, 2022.
- Mackenzie, C., & Stoljar, N., eds. *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self*, Oxford University Press, New York, 2000.
- MacKinnon, Catherine A., *Feminism Unmodified*, Harvard University Press, London, 1987.
- McCarthy, Erin, *Ethics Embodied: Rethinking Selfhood Through Continental, Japanese and Feminist Philosophies*, Lexington Books, Maryland, 2010.
- Mckeon, Richard, ed. *Aristotle*, Modern Library, New York, 2001.
- McLaren, Margaret A., *Feminism, Foucault and Embodied Subjectivity*, State University Press, Albany, New York, 2002.
- Meyers, Diana T., "Who's There ? Selfhood, Self - Regard and Social Relations", in *Hypatia*, Vol. 20, No. 4, pp. 200-215, 2005.
- Mill, John Stuart, *The Subjection of Women*, J. M. Dent & Sons Ltd., London, 1997.
- Moitra, Shefali, *Feminist Thought: Androcentrism , Communication, and Objectivity*, Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2002.
- Musschinga, Albert W. and et. al. eds., *Personal and Moral Identity*, Kluwer Academic Publishers, (eBook)-Springer Science+Business Media Dordrecht, 2002.
- Nicholson, Linda, *Gender and History*, Columbia University Press, Columbia, 1986.
- Noddings, Nel, *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*, University of California Press, Berkeley, 1984.

- Nussbaum, Martha, "Objectification", in *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 24, No. 4, pp. 249-291, 1995.
- Nye, Andrea, *Feminism and Modern Philosophy*, Routledge, New York, 2004.
- Nye, Andrea, *Words of Power – A Feminist Reading of the History of Logic*, Routledge, New York, 1990.
- Plumwood, Val, *Environmental Culture, The Ecological Crisis of Reason,* Routledge, London and New York, 2002.
- Plumwood, Val, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London, 1993.
- Plumwood, Val, "The Politics of Reason: Towards a Feminist Logic" in *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 71, No. 4, pp. 436-459, 1993.
- Puri, Bindu, and Sievers, Heiko, eds. *Reason, Morality, and Beauty: Essays on the Philosophy of Immanuel Kant*, Oxford University Press, New Delhi, 2007.
- Quine, W. V. O., "Two Dogmas of Empiricism", in *The Philosophical Review*, Vol. 60, pp. 20-43, 1951.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Sen, Amartya, "Gender Inequality and Theories of Justice", in *Women Culture and Development*, eds. by Martha Nussbaum and Jonathan Glover, Clarendon press , Oxford , pp. 259-273, 1995.
- Sen, Pranab Kumar, *Reference and Truth*, ICPR in association with Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1991.
- Skorupski, John, ed. *The Cambridge Companion to Mill*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- Sterba, James P., ed. *Ethics: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, Oxford University Press, New York , 2000.
- Stevenson, Leslie, and Haberman, David L., *Ten Theories of Human Nature*, Oxford University Press, New York, 2004.
- Steyl, Steven, "The Virtue of Care", in *Hypatia*, Vol. 34, No. 3, pp. 507-526, 2019.
- Stone, Alison, *An Introduction to Feminist Philosophy*, Polity Press, Cambridge, 2007.
- Sullivan, Roger J., *Immanuel Kant's Moral Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Tarver, Erin C., "New Forms of Subjectivity: Theoreizing The Relational Self with Foucault and Alcoff", in *Hypatia*, Vol. 26, No. 4, pp. 804-825, 2011.
- Tong, Rosemarie, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, West View Press, Colorado, 2009.
- Toole, Briana, "From Standpoint Epistemology to Epistemic Oppression", in *Hypatia* , Vol. 34, No. 4, pp. 598-618, 2019.
- Wollstonecraft, Mary, *Vindication of the Rights of Women*, ed. by M. Brody, Penguin, London, 1988.

- চ্যাটার্জি সিনহা, অতসী, ও নস্কর, মনোজ, (সম্পা.) "নারীবাদের দর্শন", বিশেষ সংখ্যা, *আলোচনা চক্র*, সম্পাদক: চিরঞ্জীব শূর, সংকলন: ৪৬, সংখ্যা: ১, পৃ. ৭-১৬৮, ২০১৯।
- দাস, রাসবিহারী, *কান্টের দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৬।
- বাগচী, নন্দিতা, ও চ্যাটার্জি সিনহা, অতসী, (সম্পা.) *দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ: ভিন্ন মননে বিচিত্র আলাপ,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৭।
- মৈত্র, পুষ্পা, ও মিত্র, মাধবেন্দ্রনাথ, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনোসমীক্ষণের রূপরেখা*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।
- মৈত্র, শেফালী, *উজানী মেয়ে*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৩।
- মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।
- সরকার, প্রয়াস, *জ্ঞান, সংশয়বাদ ও যুক্তিসিদ্ধি প্রসঙ্গে*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৯।